বীরসিংহের

সিংহ-শিশু

[বীরসিংহের সিংহ-শিশু বিদ্যাসাগর বীর !]

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস

২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

১৯৬০

—প্রকাশক—
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক
ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস
কলিকাতা—৬

মুদ্রক
শ্রীঅমলকুমার বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
বারাণসী শাখা, বারাণসী-২

লেখকের নিবেদন

স্বর্গত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাই লিখেছেন, "দস্যু রত্নাকরের রাম-নাম উচ্চারণ করবার অধিকার ছিল না। অন্য কোনো উপায় না থাকায় "মরা মরা" বলে' তাঁকে উদ্ধার লাভ করতে হয়েছিল।

"এই ··· পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়ে আমাদিকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই-এর নাম কীর্তন করতে হবে। তা না হ'লে ঐ নাম করতে আমাদের কোনোরূপ অধিকার আছে কি না, এ-বিষয়ে মস্ত একটা সংশয় আছে। প্রকৃতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড়, আর আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা, আর আমরা এত বাঁকা যে, তাঁর নাম করা আমাদের পক্ষে বিষম স্পর্ধার কথা মনে হয়। আমরা কথা বলি অনেক, কিন্তু কাজ করি অতি-কম। ঈশ্বরচন্দ্র কথা বলতেন কম, কিন্তু কাজ করতেন অনেক বেশী। এ-বিষয়ে সাধারণ বাঙালীর সংগে ঈশ্বরচন্দ্রের আকাশ-পাতাল তফাৎ।

"বিজ্ঞানশাস্ত্রে বড় জিনিষকে ছোট দেখাবার যন্ত্র আছে।······ বিদ্যাসাগরকেও দেখাবার, জানাবার জন্যে তাঁর জীবন-চরিতকেও বলা যেতে পারে—বড় জিনিষকে ছোট দেখাবার যন্ত্রস্বরূপ। কারণ, জীবন-চরিতের বইয়ে যাঁর জীবনী তাঁকে ঠিকমতো ধরা যায় না। জীবনের খুঁটি-নাটি পরিচয় জীবন-চরিতে সাধারণত পাওয়া যায় না। এই খুঁটি-নাটি পরিচয়েই চরিত-নায়কের জীবন ধরা পড়ে। এই জন্যে জীবন-চরিতের বই দেখে চরিত-নায়ককে জানা কঠিন হয়।"······

কিন্তু আমরা তো তাঁর জীবন-চরিত লিখতে বসি নি। তিনি তাঁর জীবনে কি কি কাজ করেছিলেন, তা'র আগা-গোড়া পরিচয়

কেউ-ই দিতে পারেন নি ; আমরা যে পারি, সে স্পর্ধাও আমাদের নেই। তবে তাঁর সম্বন্ধে দুটো-চারটে কথা যা শোনা যায়—সাধারণ মানুষের মধ্যে যা প্রায়ই পাওয়া যায় না, তা'রই দু-চারটে কথা এই বইয়ে লেখ্‌বার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কতদূর তা কর্‌তে পেরেছি, তা'র বিচারক আমরা নই—পাঠকগণ। তবে এ-কথা বল্‌তে পারি—চরিত-নায়কের প্রতি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা রেখেই তা বল্‌বার চেষ্টা করেছি। হয় তো তা পাঠকের রুচিকর হবে। তবে যাদের জন্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা—কোমলমতি সেই বালক-বালিকারা এই বই পড়ে' একটু আমোদ পেলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

গ্রন্থভাগে আমরা লিখেছি—ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালে একটু চপল-প্রকৃতি ছিলেন। তাঁর চপলতার দু-চারটির উল্লেখও করেছি। ছেলেবেলায় শচীবামনা পুকুরের তীরে গদাধর পাল ও আরো কয়েকজন বন্ধুর সংগে কপাটি খেলার রংগরসের পরিচয়ও দিয়েছি। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে তাঁর জীবন-চরিতে ঐ পুকুরের ও ঐ খেলার জায়গার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই জন্যে আমি ঐ স্থানের একটা ফোটোগ্রাফ বা স্কেচ পাবার জন্যে বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের (অধুনা বীরসিংহ ভগবতী মাল্‌টি পার্‌পাস ইনস্টিটিউসনের) প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ-পত্র লিখি। তাঁহারি কথামতো উক্ত ইনস্টিটিউসনের শিক্ষক এবং ড্রয়িং মাস্টার শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ভগবতী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও বিদ্যাসাগর সেবক সমিতির সম্পাদক শ্রীমান্ অনিলকৃষ্ণ মান্না মহাশয়ের সহকারিতায় ফোটোগ্রাফ পাঠাবার সুবিধা না থাকায় ঐ জায়গার একখানি রেখা-চিত্র এঁকে পাঠিয়ে দেন। সেই রেখা-চিত্র হ'তেই শচীবামনা পুকুরের আর তা'র পারিপার্শ্বিক স্থানের রেখা-চিত্র দেওয়া সম্ভব হ'ল। এই অবসরে আমি ভগবতী মাল্‌টি পার্‌পাস্

ইনস্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় M.A., B T ও তাঁহার সহকর্মী শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমান্ অনিলকৃষ্ণ মান্না মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি—ভক্তিভাজন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সুবৃহৎ বিদ্যাসাগর-জীবনী হ'তে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছি। যে-সময়ে এই জীবন-চরিতের তৃতীয় সংস্করণ এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হচ্ছিল, সেই সময়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম—আপনার এই বই হ'তে উপকরণ সংগ্রহ করে' ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে একখানি ছোট্ট বই আমি লিখ্‌বার ইচ্ছা করি। তদুত্তরে তিনি আমায় সহর্ষ সম্মতি দিয়েছিলেন। নানাকারণে এতদিন আমার সে-বাসনা পূর্ণ হয় নি। আজ আমার এই বই প্রকাশের দিনে সেই স্বর্গত মহাপুরুষের চরণে প্রণাম জানাই। ইতি—

-গ্রন্থকার

সূচীপত্র

চিত্রসূচী



তরুণ বয়সে—ঈশ্বরচন্দ্র

পূর্ব-কথা

হুগলী জেলার জাহানাবাদ (এখন তার নাম আরামবাগ) মহকুমার উত্তর-পূর্বদিকে প্রায় ছয় মাইল দূরে একখানি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের নাম বনমালীপুর। এই গ্রামে ভুবনেশ্বর বিদ্যালংকার নামে এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বাস করতেন। তাঁর পাঁচ ছেলে। নৃসিংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পঞ্চানন, রামচরণ। সেজো ছেলে রামজয় সংস্কৃত ভাষায় খুব বড় পণ্ডিত হ'য়ে উপাধি পেয়েছিলেন —তর্কভূষণ। এই তর্কভূষণ মশাই ছিলেন একটু উদোমাধা ধরনের। তিনি এক জায়গায় স্থির হ'য়ে বসে' থাক্‌তে পারতেন না; কিছুদিন এক জায়গায় আছেন—লোকে তাঁর আদর-যত্ন করে। হঠাৎ তিনি সেজায়গা ছেড়ে অন্য কোনো জায়গায় চলে' যেতেন। এই তাঁর এক বদ্‌ রোগ ছিল। কিন্তু তা হ'লে কি হবে! বড় পণ্ডিত—তর্কে তাঁকে কেউ-ই হারিয়ে দিতে পারতো না। এই খাতিরে তাঁর বিয়ে হ'য়ে গেল মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার ভিতরে বীরসিংহ গ্রামে পণ্ডিত উমাপতি তর্ক-সিদ্ধান্তের কন্যা দুর্গাদেবীর সংগে। দুর্গাদেবী শ্বশুরালয়ে বহুপরিবারের মধ্যে বাস করেন। পণ্ডিতের বাড়ী। বিষয়-সম্পত্তি তেমন বেশী ছিল না তাঁদের। সেই সময়ের পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে গিয়ে যা-কিছু 'বিদেয়' পেতেন তার দ্বারাই তাঁদের সংসার চল্‌তো। কাজেই, তাঁদের সংসার খুব সচ্ছল ছিল না। দুর্গা-

দেবীর তখন দুটি ছেলে— ঠাকুরদাস আর কালিদাস; আর চারটি মেয়ে—মঙ্গলা, কমলা, গোবিন্দমণি আর অন্নপূর্ণা। সংসারে নানারকম খিটিমিটি হওয়ায় রামজয় হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে' চলে' গেলেন—নিরুদ্দেশের পথে। ছ'টি ছেলে-মেয়ে, দুর্গাদেবী নিজে; ঐ টানাটানির সংসারে এই সাতটি প্রাণীর একটু কষ্ট ও অসুবিধা হ'তে লাগ্‌লো। তাই তিনি কিছু দিন কোনো রকমে কাটিয়ে চলে' এলেন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে—বাপের বাড়ীতে—বীরসিংহ গ্রামে। মেয়ে তার ছেলে-মেয়েগুলিকে নিয়ে এসেছে তাঁর বাড়ীতে জামাই চলে' গেছেন কোথায়-কেউ জানে না তাঁর সন্ধান। উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত অতগুলি লোকের খাওয়া-পরা চালানো কষ্টকর মনে করলেও মেয়েকে তো আর বিদেয় করে' দিতে পারেন না। অসুবিধা হ'লেও দুর্গাদেবী অতি কষ্টে পিতার সংসারে কিছু দিন রইলেন। যখন নিতান্ত কষ্টকর হ'তে লাগ্‌লো, তখন তিনি পিতার অনুমতি নিয়ে সেই বীরসিংহ গ্রামে এক জায়গায় একখানি ছোট্ট মাটির ঘর তৈরি করে' ছেলে-মেয়ে ছ'টিকে নিয়ে অতি কষ্টে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। তাঁদের খাওয়া-পরার খরচ চল্‌তো—দুর্গাদেবী টেকোতে অথবা চরকায় সূতো কেটে সেই সূতো বিক্রী করে' যা পেতেন তাই দিয়ে।

ঠাকুরদাসের বয়স এই সময়ে পনের বছর। সংসারের দুঃখ-কষ্ট তিনি এখন বেশ বুঝ্‌তে পারেন। সে-কালের নিয়ম অনুসারে পাঠশালায় সামান্য বাংলা ও সংস্কৃত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ তিনি পড়েছেন। বাড়ীতে তিনি আর থাক্‌তে পারলেন না—মায়ের

দুঃখ-কষ্ট দেখে। কাজেই, মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি সামান্য কিছু উপায় করে' মায়ের কষ্ট দূর করতে পারবেন বলে' কল্‌কাতায় চলে' গেলেন। কল্‌কাতায় গিয়ে উঠলেন, তাঁদের জ্ঞাতি-ভাই জগন্মোহন ন্যায়ালংকার মশাইয়ের বাসা-বাড়ীতে। তিনি সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত, ন্যায় শাস্ত্র পড়ে' ন্যায়ালংকার উপাধি পেয়েছেন ; কল্‌কাতায় তাঁর যথেষ্ট সম্মান। ন্যায়ালংকার খুব আদর করে' ঠাকুরদাসকে নিজের বাসায় থাক্‌বার ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে' দিলেন। ঠিক হ'ল ঠাকুরদাস তাঁর টোলে সংস্কৃতই পড়বেন। কিন্তু ঠাকুরদাস বুঝ্‌লেন, সংস্কৃত শিখে পণ্ডিত হ'য়ে অর্থ উপার্জন করতে হ'লে অনেক সময় চাই। এই জন্যে তিনি সংস্কৃত পড়া ছেড়ে দিয়ে কাজ চালাবার মতো ইংরাজী শিখ্‌বেন, এইরূপ স্থির করলেন। কিন্তু ইংরাজী পড়েন কি করে'। এখনকার মতো তখন ইংরাজী শিখ্‌বার তেমন সুযোগ ছিল না। ইংরাজী-জানা লোকও নেই—স্কুলও নেই। ইংরাজী শেখেন কেমন করে'! তখন লোকে সাহেবদের 'হাউস'-এ কাজ করবার জন্যে কতকগুলি ইংরাজী শব্দ মাত্র শিখে রাখ্‌তো; আর তারই সাহায্যে কোনোরকমে সাহেবদের সংগে কাজ চালিয়ে নিতো। ন্যায়ালংকার মশাইয়ের এক বন্ধু কাজ চালাবার মতো ইংরাজী জান্‌তেন। তাঁর কাছেই তিনি ইংরাজী শিখ্‌তে লাগ্‌লেন—সন্ধ্যার পরে। কারণ, দিনের বেলায় তাঁর পড়াবার সময় হ'ত না।

কিন্তু ঐ ভদ্র লোকের বাড়ী ন্যায়ালংকারের বাসা-বাড়ী হ'তে অনেক দূরে। সন্ধ্যার পরে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে

ইংরাজী পড়ে' বাসায় ফির্‌তে তাঁর দেরী হ'য়ে যেত—তখন ন্যায়ালংকার মশাইয়ের ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া সব শেষ হ'য়ে যেত। কাজেই, ঠাকুরদাসের আর খাওয়া হ'ত না। এই জন্যে কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুরদাস খুব কাহিল হ'য়ে পড়লেন। ঠাকুরদাসের ঐ রকম অবস্থা দেখে, আর ঠাকুরদাসের মুখে সব কথা শুনে সেই ভদ্রলোকটির এক বন্ধু নিজের বাড়ীতেই ঠাকুরদাসের থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করে' দিলেন—অবশ্য, ঠাকুরদাসকে নিজে দু-বেলা রেঁধে খেতে হবে। ঠাকুরদাস এই ব্যবস্থায় খুবই খুসী হলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ঐ আশ্রয়-দাতার অবস্থা খারাপ হ'য়ে পড়ায় তিনি ঠাকুরদাসের দু-বেলা সিধে দিতে কষ্ট বোধ করতে লাগ্‌লেন। ঠাকুরদাস সব বুঝে দিশাহারা হ'য়ে পড়লেন। তাঁর মনে পড়লো সেই সংস্কৃত উদ্ভট কবিতাটি। তোমরা তো সংস্কৃত বুঝবে না; তাই বাংলা কবিতায় অনুবাদ করে' তোমাদের শোনাই :—

বিধাতা বিরূপ হইলে সাগরে মিলেনাকো ফোঁটা জল।
কল্প-পাদপের কাছে চাহিলেও মিলেনাকো কোনো ফল॥
এক ফোঁটা সুধা মিলে না তখন সুধাকর সুধাকরে।
এক রতি সোনা তবে মিলিবে না সুমেরু শিখর'পরে॥

ঠাকুরদাস ভাবলেন—অদৃষ্ট মন্দ হ'লে সমুদ্রেও জল পাওয়া যায় না—সুধার আকর চন্দ্র একবিন্দু সুধা দিতে পারেন না—কল্পবৃক্ষের কাছে চাইলেও কোনো ফল পাওয়া যায় না। সোনার খনি সুমেরু পর্বতে সোনার কণা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়। কি আর

করেন,—ভগবানের বিধান ভেবে সব ব্যথা চেপে কায়ক্লেশে দিন কাটাতে লাগলেন। শেষে একদিন এমন অবস্থা হয়েছিল যে, এক মুড়ি-মুড়কীওয়ালীর দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে—কিছু খেতে দাও', আর বল্‌তে না পেরে, 'বড় তেষ্টা পেয়েছে মা, একটু খাবার জল দেবে?' বল্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন। ঐ মুড়ি-মুড়কীওয়ালী জল তো দিলই—আর তার সংগে দিল—কিছু মুড়ি-মুড়কী। ক্ষিদের জ্বালায় ঠাকুরদাস এমন তাড়াতাড়ি করে' সেই মুড়ি-মুড়কীগুলি খাচ্ছেন দেখে সে বুঝেছিল—ছেলেটির এখনো খাওয়া হয়নি। বুঝেই সে বলেছিল, বাবা, তোমার এখনো খাওয়া হয়নি বোধ হয়। ঠাকুরদাস বলেছিলেন, না, মা, আমার এখনো খাওয়া হয়নি। শুনেই সেই মুড়ি-মুড়কীওয়ালী বলেছিল—একটু সবুর কর বাবা, তোমাকে আমার এখানে ফলার করাই। এই কথা বলে' সে নিকটেই যে দই-দুধের দোকান ছিল, সেই দোকান হ'তে দই কিনে এনে আদর করে' ঠাকুরদাসকে দোকানের একপাশে বসিয়ে চিঁড়ে-মুড়কী দই দিয়ে ফলার করিয়ে বলেছিল—বাবা, যেদিন তোমার খাওয়া না হবে, সেদিন তুমি আমার এখানে এসে ফলার করে' যাবে। এই কথা শুনে ঠাকুরদাস যে কত খুসি হয়েছিলেন, তা আর কি বল্‌বো।

বাসায় গিয়ে ঠাকুরদাস তাঁর আশ্রয়দাতাকে বলেছিলেন, যেমন করেই হোক তাঁর একটি চাকরী করে' দেবার জন্যে। সদাশয় সেই ভদ্রলোকটি অনেক চেষ্টা করে' কয়েকদিনের মধ্যে দুটাকা মাইনের একটি চাকরী করে' দিলেন—ঠাকুরদাসের। চাকরী পেয়ে

ঠাকুরদাসের যে কত আনন্দ হয়েছিল—তা বোধ হয় আর বল্‌তে হবে না। এই খবর পেয়ে মা দুর্গাদেবীও বীরসিংহের বাড়ীতে "হরির লুঠ" দিয়েছিলেন, আর কত আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুরদাসের মাসিক মাইনে ঐ জায়গাতে ৫৲ পাঁচ টাকা হয়েছিল। মায়ের আর ভাই-বোনগুলির কষ্টের কিছু লাঘব হবে বুঝে ঠাকুরদাস আরো মনোযোগ দিয়ে ঐ কাজ করতে লাগ্‌লেন।

এই সময়ে রামজয় তর্কভূষণ হঠাৎ বনমালীপুরে ফিরে এলেন। দেখ্‌লেন, সেখানে তাঁর স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে কেউই নেই। খবর নিয়ে জান্‌লেন, তাঁরা সকলে চলে' গেছেন—বীরসিংহে। তিনি এসে গোপনে বীরসিংহে কয়েকদিন কাটাবার পর একদিন তাঁর ছোট মেয়ে অন্নপূর্ণা তাঁকে দেখে চিন্‌তে পারে। সে তাঁকে দেখে "বাবা, বাবা" বলে' চীৎকার করে' ওঠে। তর্কভূষণ আর লুকিয়ে থাকতে পারলেন না; সকলের কাছে তাঁকে পরিচয় দিতে হ'ল। রইলেন তিনি কয়েকদিন বীরসিংহে। তারপর ছেলে ঠাকুরদাসের সংগে দেখা করবার জন্যে গেলেন— কল্‌কাতায়।

তর্কভূষণ মশাইয়ের সংগে বড়বাজারের এক ধনী ব্যক্তি ভাগবতচরণ সিংহ মশাইয়ের জানাশোনা ছিল। ঠাকুরদাসের কথা শুনে এবং ঠাকুরদাস এই কল্‌কাতাতেই আছেন জেনে, তর্কভূষণ মশাইকে বল্‌লেন—ঠাকুরদাসকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসবার জন্যে। তাই ঠাকুরদাসকে তিনি বড়বাজারের ঐ বাড়ীতে নিয়ে এলেন। সিংহ মশাই ঠাকুরদাসকে বাড়ীতেই থাক্‌বার

জায়গা দিলেন ও দু-বেলা সিধে দিতে লাগ্‌লেন। কিছুদিন পরে ঐ সিংহ মশাই ঠাকুরদাসের একটি চাকরী করে' দেন। তার মাসিক মাইনে ৮৲ আট টাকা।

ঠাকুরদাস আটবছর কল্‌কাতায় এসেছেন, আর তাঁর মাইনে হয়েছে আট টাকা; তাঁর বয়সও হয়েছে ২৩।২৪ বছর। তর্কভূষণ ঠাকুরদাসের বিয়ে দেবার ইচ্ছে করলেন এবং কিছুদিন পরেই ঠাকুরদাসের বিয়ে দিলেন—গোঘাট-নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের ছোট মেয়ে ভগবতী দেবীর সংগে। কিন্তু এই বিয়ে হয়েছিল—পাতুল গ্রামে—ভগবতী দেবীর মামার বাড়ীতে। কারণ, তাঁর মা পাগল। তাই বাবা, বড় বোন সকলেই থাক্‌তেন—ঐখানেই। তাঁর মামার নাম ছিল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ। তাঁর সংসার ছিল আদর্শ হিন্দু পরিবার। অতিথিদের সেবা করা, হঠাৎ যাঁরা বাড়ীতে এসে পৌঁছতেন, তাঁদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে' দেওয়ার দিকে বিদ্যাভূষণ মশাই বিশেষ নজর রাখতেন। খুব বড় করেই দেখ্‌তেন তিনি সেবাধর্মটিকে।

হ্যাঁ, একটা কথা বলা হয়নি এতক্ষণ। ঠাকুরদাসের বাবা রামজয় তর্কভূষণের অনেক কথাই বলেছি। কিন্তু বলা হয়নি তাঁর গায়ের জোরের কথা—মনের বলের কথা—ধর্মের দিকে অনুরাগের কথা। একে একে বলি, শোন। একবার তিনি যাচ্ছিলেন বাড়ী হ'তে মেদিনীপুরের পথে। একটা বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা। তর্কভূষণ পড়লেন একটা ভালুকের সাম্‌নে।

পালাবার পথ না পেয়ে একটা ছোট গাছের আড়ালে তিনি দাঁড়ালেন। ভালুকটা তাঁকে গাছের আড়ালে দেখে সাম্‌নের দুটো পা তুলে দাঁড়ালো গাছটার উল্টো দিকে। তর্কভূষণ করলেন কি জানো? তিনি সেই ভালুকের সাম্‌নের পা দুটো সেই গাছের দু-দিকে ধরে' ঘসতে লাগলেন। অনবরত ঘস্‌টানিতে ভালুকটা মরার মতো হ'য়ে পড়লো। মরে' গেছে মনে করে' তিনি সেইখানে ভালুকটাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চল্‌লেন—মেদিনীপুরের পথে। কিন্তু ভালুকটা মরেনি—একটু সাম্‌লে নিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে' ছুট্‌লো তর্কভূষণের দিকে—আর তর্কভূষণের গায়ে ফুটিয়ে দিল তার ধারালো নখ। তর্কভূষণের গা দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে' রক্ত পড়তে লাগ্‌লো। তর্কভূষণ কাপড়-চোপড় বাগিয়ে নিয়ে হাতে যে একটা লোহার ডাণ্ডা ছিল—তাই দিয়ে দে মার—দে মার! এক ঘা—দু-ঘা—দশ ঘা। কয়েক ঘায়েই ভালুকটা চিৎপাত হ'য়ে পড়লো। এমনি ছিল তাঁর গায়ের জোর। এবার তাঁর মনের জোরের কথা শোন। তিনি কখনো কারো কাছে ছোট হ'য়ে থাক্‌তে পারতেন না। কষ্টে পড়লেও কারো কাছে কোনো প্রত্যাশাই তিনি করেননি। তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী। কারো অন্যায় দেখ্‌লে তিনি তখ্‌খনি তার প্রতিবাদ করতেন—সে অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁর কোনো ক্ষতি করবে—না ভেবে। রাগ তাঁর ছিল খুব, কিন্তু রাগ করে' কারো উপর তিনি অন্যায় ব্যবহার করতেন না। ছোট-বড়র বিচার করতেন তিনি লোকের আচরণ দেখে। যে খারাপ কাজ করতো, সে

ভদ্রবংশের ছেলে হ'লেও তাকে ছোটলোক বল্‌তেন; আবার বাগদী-দুলে হ'য়েও যদি সৎকাজ করতো, তবে তাকে ভদ্র বলেই মনে করে' তার সমাদর করতেন। বড়-ছোটর বিচার করতেন তিনি তাদের কাজ দেখে। এইবার শোনো তাঁর ধর্মের দিকে অনুরাগের কথা। তিনি একবেলা খেতেন, মাছ-মাংস খেতেন না —ভাল কাজ করতে তাঁর অনুরাগ ছিল প্রচুর। গরীবের প্রতি দয়া তাঁর ছিল খুব বেশী। গৃহত্যাগ করে' তিনি তীর্থে তীর্থেই বেড়িয়ে বেড়াতেন। শেষবার তিনি যখন সংসারের ওপর বিরক্ত হ'য়ে সংসার ছেড়ে চলে' যান—তখন তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি নানা তীর্থস্থানে আট বছর কাল বেড়িয়েছিলেন। জ্বালামুখী তীর্থেই তিনি সংসারে ফিরে আস্‌বার আদেশ পেয়েছিলেন। যখন তিনি বীরসিংহে এসে পৌঁছলেন, তখন বীরসিংহের ও তার নিকটস্থ গ্রামের লোক সকল তাঁকে কোনো প্রসিদ্ধ যোগী বা ঋষি মনে করে' তাঁর ওপর অশেষ শ্রদ্ধা জানাতো।

ঠাকুরদাসেরও অনেক গুণ ছিল। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ও পরদুঃখকাতর। এই গুণ তিনি পেয়েছিলেন—ছেলেবেলায় বহু কষ্ট পেয়ে। তিনি যেখানে কাজ করেছেন—সেখানেই তিনি সুখ্যাতি পেয়েছেন। কাজে ফাঁকি দিতে তিনি জান্‌তেন না। যে-কাজটি করতে হবে—শ্রদ্ধার সংগে তা শেষ করতেন। তাঁর কাজে কেউ কখনো খুঁৎ দেখতে পাননি। এই জন্যেই তাঁকে সকলে ভালবাসতো।

মা ভগবতী দেবীর দয়ার তো তুলনা হয় না। মনে হ'ত যেন দয়া মূর্তি ধরে' ভগবতী দেবীর রূপে এসেছেন—এই পৃথিবীতে। ক্রমে তোমরা ভগবতী দেবীর এই সব গুণের পরিচয় পাবে। ফলে, হয়েছিল এঁদের বংশে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব—দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর-রূপে। এই বইয়ে তোমাদিগকে তাঁর কথাই বল্‌বো।

ছেলেবেলা

রামজয় তর্কভূষণ কিছুদিন হ'ল হিমালয় পর্বত হ'তে বাড়ীতে ফিরে এসেছেন—স্বপ্নে আদেশ পেয়ে। ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন, মংগলবার—বেলা ঠিক বারোটা। শরতের রোদ খাঁ খাঁ করছে। হঠাৎ তর্কভূষণের বাড়ীতে শাঁখ বেজে উঠ্‌লো। বাড়ীর মেয়েদের কলরবে ঘরখানি গেল ভরে'। তর্কভূষণ পুঁথি খুলে কি পড়ছিলেন। শাঁখের শব্দ আর পুরনারীদের কলরব শুনে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন—কারণ জান্‌বার জন্যে। পরিচয় পেয়ে জান্‌লেন, তাঁর বড় ছেলে ঠাকুরদাসের এক ছেলে হয়েছে। এর প্রতীক্ষাই তিনি করছিলেন। স্বপ্নের কথা সত্যি হ'ল। তিনি পুঁথি খুলে কি এক মন্ত্র বের করলেন—আর তখ্‌খনি আল্‌তা গুলে সেই আল্‌তা-গোলা নিয়ে আঁতুড় ঘরের দরজায় পৌঁছলেন। ধাত্রী তখন প্রসূতির ময়লা কাপড়-চোপড় সব সরিয়ে ফেলে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে' সেই সদ্য-ফোটা ফুলের মতো টুক্‌টুকে ছেলেটিকে তার মায়ের কোলে দিয়েছে। মা ভগবতী দেবী ছেলেটিকে কোলে করে' আছেন – ভগবতীর কোলে কার্ত্তিকের মতো। তর্কভূষণ ছেলেটিকে দেখেই বুঝলেন, স্বপ্নে যে মহাপুরুষের জন্মের কথা জেনেছিলেন, এই ছেলেটিই সেই মহাপুরুষ হবে। এর দেহে, চোখে, মুখে, কপালে যে-সব লক্ষণ তিনি দেখ্‌লেন, তাতে তাঁর বুঝতে বাকি রইলো না—এই ছেলেটি ক্ষণজন্মা

মহাপুরুষ। তিনি খুব খুসি হ'য়ে তখনি প্রসূতির দিকে এগিয়ে এসে শিশুর জিভের তলায় সেই আল্‌তা-গোলা রঙ দিয়ে কি এক মন্ত্র লিখে দিয়ে বল্‌লেন—বৌমা, ভয় পেয়ো না—এই শিশু বড় শুভক্ষণে জন্মেছে—এর থেকে আমার বংশের মান বেড়ে উঠবে—আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে। কিন্তু মা, এই ছেলেটি কিছুদিন—বোধ হয় ৮।৯ বছর পর্যন্ত একটু তোত্‌লা থাক্‌বে—আর একটু অতিরিক্ত দুষ্টুও হবে। যাই হোক, তোমরা জান্‌বে, এই শিশু যা ধরবে, তাই করবে; যা বল্‌বে, যেমন করেই হোক তা করবেই করবে—আর খুবই একগুঁয়ে হবে। এর সারা দেহে যে-সব লক্ষণ দেখ্‌ছি, তাতে এর নাম আমি আজই এই আঁতুড়-ঘরেই **ঈশ্বরচন্দ্র** রাখ্‌লাম। এর এই ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য কোনো নাম হ'তে পারে না। ভগবতী দেবী শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করে' তাঁর হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করলেন; আর সেই পরম পণ্ডিত শ্বশুরের কথা সত্যই হবে মনে করে' তিনি যে কত খুসি হয়েছিলেন তা বলে' শেষ করা যায় না।

তর্কভূষণ আঁতুড়-ঘর হ'তে বেরিয়ে এসে সেই সুসমাচারটি দেবার জন্যে ছেলে ঠাকুরদাসের খোঁজ করতে লাগ্‌লেন। খবর পেলেন, ঠাকুরদাস বাড়ীতে নেই—কোমরগঞ্জের হাটে গেছেন তরি-তরকারী কেন্‌বার জন্যে। তিনি ছেলেকে এই সুখবর জানাবার জন্যে কোমরগঞ্জের পথে কতকটা এগিয়ে চলেছেন। দেখ্‌লেন—দূরে ছেলে ঠাকুরদাস গামছায় হাটের-কেনা তরকারীগুলি বেঁধে

কাঁধে ফেলে আস্‌ছেন। দুপুরের রোদে তাঁর সর্বশরীর হ'তে ঘাম ঝরে' পড়ছে—রোদে মুখখানি শুকিয়ে গেছে। তর্কভূষণ ছেলেকে দেখেই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—ওরে ঠাকুরদাস, আমাদের একটা "এঁড়ে বাছুর" হয়েছে। শুনে ঠাকুরদাস খুবই খুসি হ'লেন। বাড়ীতে দুধের কষ্ট হচ্ছিল—যাই হোক, দুধের কষ্ট এইবার ঘুচ্‌বে। ঠাকুরদাস এই কথাটিই মনে করে' বাড়ী পৌঁছেই গামছা-বাঁধা তরি-তরকারীগুলো নামিয়ে তাড়াতাড়ি গোয়াল ঘরের দিকে যেতে লাগ্‌লেন। তর্কভূষণ ছেলেকে গোয়াল ঘরের দিকে যেতে দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে ছেলের কাছে এসে বল্‌লেন—ওদিকে নয়—আমার সংগে এস—তোমায় "এঁড়ে বাছুর" দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে' তিনি ঠাকুরদাসের হাত ধরে' তাঁকে আঁতুড়-ঘরের দিকে নিয়ে গিয়ে পুত্রবধূর কোলে ছেলেটিকে দেখিয়ে বল্‌লেন—এই ত্যাখ্‌ "এঁড়ে বাছুর"। এঁড়ে বাছুর আমি এম্‌নি বলিনি। এই ছেলেটি এঁড়ে বাছুরের মতোই একগুঁয়ে হবে। আমি এই ছেলের সব লক্ষণ দেখে আজই এর নাম রেখেছি **ঈশ্বরচন্দ্র**। এর এই নামের আর অন্যথা তোমরা কোরো না। আর এক কথা, আমিই এর গুরু হলাম। এর আর গুরু-করণ হবে না। ঠাকুরদাস পিতার পায়ে প্রণাম করে' বললেন—বাবা, তা হ'লে ছ'মাস অপেক্ষা না ক'রেই আজই নাতীর নাম-করণটা সেরে ফেলেছেন!

এক দুই ক'রে ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স চার বছর পূর্ণ হ'য়ে গেল। ঈশ্বরচন্দ্র পাঁচ বছরে পড়েছেন। তখনকার নিয়ম অনুসারে আরো পাঁচ মাস পাঁচ দিন কেটে গেলে একটি ভালো দিন দেখে ঠাকুরদাস

ঈশ্বরের হাতে খড়ি দিয়ে তাঁকে ভর্তি করে’ দিলেন—গ্রামের পাঠশালায়। পাঠশালার শিক্ষকের নাম কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে ঈশ্বরচন্দ্র সেই দিনেই অ, আ, ক, খ—সমস্ত অক্ষরগুলিইপড়তে,চিন্‌তে, এমন কি, লিখ্‌তেও শিখেছিলেন। ঈশ্বরের বাহাদুরী দেখে গুরুমশাই তো অবাক্। এতদিন এত ছেলে পড়াচ্ছেন, এমন অদ্ভুত ছেলে তো তিনি কখনো দেখেন নি। বৈকালে ঈশ্বরচন্দ্রকে কোলে করে’ নিয়ে গেলেন—ঠাকুরদাসের কাছে। গিয়ে বল্‌লেন—ঠাকুরদাস, ঈশ্বরের আজই অক্ষর পরিচয় সব হ’য়ে গেছে ! শুনে ঠাকুরদাস বল্‌লেন—বল কি খুড়ো ! তাও কি সম্ভব ! কালীকান্ত বল্‌লেন—পরীক্ষা করে’ দেখ না কেন ? ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে বল্‌লেন, বল তো বাবা ঈশ্বর, অ, আ, ক, খ। ঈশ্বরচন্দ্র বাবার কথা শুনে গড়্ গড়্ করে’ বলে’ গেলেন—সব অক্ষরগুলি। তারপর ঠাকুরদাস পরিষ্কার করে’ একটি অক্ষর লিখে বল্‌লেন—বলতো ঈশ্বর, আমি যে অক্ষরটি লিখেছি, তার নাম কি ? ঈশ্বর তখ্‌খনি বলে’ ফেল্‌লেন। এইরূপে আবার দু-চারটি অক্ষর লিখে ঠাকুরদাস তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। ঈশ্বর প্রত্যেক অক্ষরটির নাম বলে’ গেলেন। এই ব্যাপার দেখে সকলেই বিস্মিত হ’য়ে পড়েছিল ! কালীকান্ত আরো মনোযোগ দিয়ে আদর করে’ ঈশ্বরচন্দ্রকে পড়াতে লাগ্‌লেন। পাঠশালার অন্য ছেলেদের সংগে পড়ানো ছাড়া কালীকান্ত সন্ধ্যার পর ঈশ্বরকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতেন—কোলে করে’। সেখানে দাওয়ায় বসিয়ে সোজা সোজা মানসাংক, আর দু-চারটে সংস্কৃত উদ্ভট

শ্লোক শেখাতেন। লেখাপড়ায় তুখড় হলেও ঈশ্বরের দুষ্টবুদ্ধিও কম ছিল না। তাঁর ছেলেবেলার দুরন্তপনার দু-একটা কথা বলি, শোন :—

পাড়ায় মথুর মণ্ডল নামে এক ঘর চাষী লোকের বাস ছিল। তার স্ত্রীর নাম সুভদ্রা—মায়ের নাম পার্বতী। ঈশ্বরচন্দ্রের একটা বদ্ রোগ ছিল—তিনি প্রায় প্রতিদিন তাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে যাবার সময়ে তাদের বাড়ীর সদর দরজার কাছে প্রস্রাব করতে বসতেন। সুভদ্রার রোজ রোজ এ অত্যাচার সহ্য হবে কেন? সে ঈশ্বরচন্দ্রকে এজন্যে এক একদিন খুব গাল-গালাজ দিত। শাশুড়ী পার্বতী বৌকে বলতো—ও ছেলেটিকে চেনো না! তর্কভূষণ মশাই কেমন লোক জানো? সে তার নাতী। তিনি স্বপ্নে ঐ ছেলের জন্মের কথা জেনে হঠাৎ বাড়ীতে এসে বলেছেন—এই ছেলে হয়েছে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তাকে ওরূপ শক্ত কথাগুলো আর বোলো না। বৌ আর কিছু বল্‌তো না। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বৌয়ের সেই রকম খারাপ কথা শুনে মনে মনে বল্‌তেন—আচ্ছা, দাঁড়া—তোদিকে এই গাল-গালাজের প্রতিফল দিচ্চি; দেখ্‌বো কেমন করে' বাড়ী হ'তে বের হোস্!

ঈশ্বরচন্দ্র করতেন কি জানো? তিনি খুব ভোরে উঠে যত রাজ্যের ময়লা কুড়িয়ে—ছেঁড়া কাঁথা, নোংরা মাদুর-চাটাই, ছুতো হাঁড়ি-খোলা, কত কি কাঁটা এনে ফেলে দিতেন তাদের বাড়ীর দোরে। এমন কি, সদর দরজার কপাটে পর্যন্ত ময়লা লাগিয়ে রাখ্‌তেন। পার্বতী সকাল বেলায় দোর খুল্‌তে গিয়ে ঐ-সব

নোংরা জিনিষ দেখেই বুঝ্‌তে পারতো, এ-সব আর অন্য কারো কাজ নয়—তর্কভূষণ মশাইয়ের নাতীই এই কাজ করেছে। এই ভেবে সে আর বেশী কিছু না বলে' ঐ-সব নোংরা জিনিষ সরিয়ে ফেলে, স্নান সেরে বাড়ীতে আস্‌তো। ঈশ্বরচন্দ্রের সংগে দেখা হ'লে বল্‌তো, "বাবা ঈশ্বর, এ রকম কি করতে আছে ? এমন কাজ আর কোরো না।" ঈশ্বরচন্দ্র মুখ গম্ভীর করে' বল্‌তেন—"কেন করব না—আমাকে তোমার বৌ গাল দিয়েছিল কেন ? তাইতো এ-সব করেছি। জব্দ হয়েছ তো !"

শুধু এই-ই নয়। পাড়ার কেউ রাস্তার ধারে ভিজে কাপড় শুকোতে দিয়েছে। দেখেই তাঁর মাথায় চেপে বস্‌তো—শয়তান। ঈশ্বরচন্দ্র একটা কাঠিতে করে' ময়লা এনে সেই কাপড়ে লাগিয়ে দিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে যেতেন সেখান থেকে। কারো বাগানে ঢুকে পেয়ারা পেড়ে খাওয়া—কাঁচা পেয়ারা ছিঁড়ে নষ্ট করে' ফেলা—এ রকমও বদ্‌-অভ্যাস তাঁর ছিল। যাই হোক, তর্কভূষণ মশাইয়ের নাতী ভেবে এ-সবের জন্যে তাঁকে কেউ তেমন কিছু বলতো না।

ঈশ্বরচন্দ্রের দুরন্তপনার কথা তোমরা শুনলে। এখন আর একটি গুণের কথা শোন :—বেড়াতে বেরিয়েছেন—দুধারে যা দেখ্‌তে পেতেন তাই ছিঁড়ে মুখে পূরে চিবোনো তাঁর রোগ ছিল। শীতকাল। একদিন তিনি মাঠের দিকে বেড়াতে গেছেন—বৈকালে। দেখ্‌লেন—যবের শীষ বেরিয়েছে। তাই গোটাকয়েক

ছিঁড়ে মুখে পুরে চিবোতে লাগ্‌লেন। যবের শীষে মোটা মোটা শুঁয়ো থাকে, তোমরা জানো। হঠাৎ একটা শুঁয়ো তাঁর গলায় আট্‌কে গেল। কিছুতেই বের হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র খক্ খক্ করে' কাশ্‌তে লাগ্‌লেন। কাশ্‌তে কাশ্‌তে দম আট্‌কে যায় আর কি! অতি কষ্টে বাড়ীতে ফিরে এলেন। বাড়ীর মেয়েরা সেই শুঁয়ো বের করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলেন; কিন্তু কিছুতেই সেই শুঁয়ো বের হ'ল না। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণ যায় আর কি! ঠাকুমা দুর্গাদেবী তখন বাড়ীতে ছিলেন না। হঠাৎ বাড়ীতে এসেই দেখ্‌লেন—এই বিপদ! তিনি তখ্‌খনি ঈশ্বরচন্দ্রের গলায় হাত পুরে সেই শুঁয়ো বের করে' ফেল্‌লেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের চোখ মুখ স্থির হ'য়ে গেছ্‌লো। শুঁয়ো বের হ'য়ে যাবার পর তিনি সুস্থ হ'লেন। কাঁদো-কাঁদো স্বরে ঠাকুমাকে বল্‌লেন—এমন কাজ আর করবো না। তোমরা বোধ হয় এই গল্প শুনে ঈশ্বরচন্দ্রকে মনে মনে বল্‌ছো—কেমন জব্দ!

এই রকম করে' কেটে গেল তিন বছর।* কালীকান্তের পাঠশালায় যতদূর পড়া হোত, ঈশ্বরচন্দ্রের তা শেষ হ'য়ে গেল।

---

* কিন্তু ঠিক তিন বছর কালীকান্তের পাঠশালায় ঈশ্বরের পড়া হয় নি। এক বছর পড়ার পর তাঁর খুব অসুখ হয়। তা'তে তাঁর শরীরখানা হাড়-সার হ'য়ে যায়। অসুখ সারাবার জন্যে ঈশ্বরের মায়ের মামা তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যান। ছ-মাস ওষুধ খেয়ে সুস্থ হ'লেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহে ফিরে এসে আবার কালীকান্তের পাঠশালায় পড়াশুনা আরম্ভ করেছিলেন।

কালীকান্ত তাই একদিন ঠাকুরদাসের কাছে এসে বল্‌লেন, খুড়ো! আমার পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা হ'তে পারে, ঈশ্বরের তা হয়েছে। ঈশ্বর এই তিন বছরে যা শিখেছে, পাঁচ-ছ বছরেও অন্য ছেলেরা তা পারে না। ঈশ্বর খুবই বুদ্ধিমান—স্মৃতিশক্তি এর খুব তীক্ষ্ণ; এ'কে আর আমার এখানে রাখা উচিত হবে না; তুমি তো কল্‌কাতায় থাকো, ঈশ্বরকে সেইখানে নিয়ে যেয়ে কোনো ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করে' দিয়ো। দেখ্‌বে ঈশ্বর মানুষের মতো মানুষ হবে—তোমার, আর তোমার বংশের মান বাড়বে। কালীকান্তের সংগে এই রকম কথাবার্তা হবার পর ঈশ্বরকে কল্‌কাতায় নিয়ে যাওয়াই ঠিক হ'ল।

ঠাকুরদাস একটি ভালো দিন দেখে ঈশ্বরচন্দ্রকে কল্‌কাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। এই তো আট বছরের ছেলে, এত পথ হেঁটে যাবে কি করে! এখনকার মতো তখন তো ও-দিকে গাড়ী-ঘোড়া, মোটর বাস্‌ কিছুই চল্‌তো না। তাই তিনি একটি লোক ঠিক করলেন। তার নাম আনন্দীরাম গুটী। ঈশ্বর হেঁটেই চল্‌বে—যতক্ষণ পারে। যখন পা ধরে' যাবে, তখন ঐ আনন্দীরাম ঈশ্বরকে কোলে বা কাঁধে করে' নিয়ে যাবে। কালীকান্ত গুরু-মশাইও তাঁদের সংগে চল্‌লেন। প্রথম দিনে তাঁরা ৬ ক্রোশ গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মা ভগবতী দেবীর মামার বাড়ী পাতুল গ্রামে পৌঁছেছিলেন। রাত্রিটা সেখানে কাটিয়ে সকাল বেলায় তাঁদের আবার যাত্রা সুরু হ'ল।

ঈশ্বরচন্দ্র কখনো হেঁটে, কখনো বা আনন্দীরামের কোলে বা কাঁধে চড়ে' আস্‌ছেন। পথের দুধারে যত-কিছু দেখ্‌তেন তাদের

সকলি তাঁকে যেন কত নূতন কথা শোনাতো—বীরসিংহের নিত্য-দেখা পথ-ঘাট বা গাছ-পালা যে-কথা তাঁকে শোনায় নি। ঈশ্বরচন্দ্র এসে পৌঁছেছেন—শিয়াখালায়। সেখানে এসে পেলেন তাঁরা পাকা রাস্তা। চল্‌তে চল্‌তে রাস্তার একপাশে একটা পাথর পোতা আছে দেখে ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, ঐ বাট্‌না-বাটা শিল খানা ওখানে পোতা কেন?" পিতা ঠাকুরদাস বল্‌লেন, "ঈশ্বর, ওটা বাট্‌না-বাটা শিল নয়—ওকে বলে 'মাইল-ষ্টোন'।" ঈশ্বরচন্দ্র বল্‌লেন, "বাবা, মাইল-ষ্টোন তো বুঝ্‌লাম না—ওটা কি?" ঠাকুরদাস বল্‌লেন, "ওটা ইংরাজী কথা। মাইল মানে প্রায় আধক্রোশ, আর ষ্টোন মানে পাথর। প্রতি এক মাইল অন্তর ঐ রকম এক একখানা পাথর পুতে সেই রাস্তা যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে সেখান হ'তে ঐজায়গা পর্যন্ত কত দূর, তাই খুদে দেওয়া হয়, লোকে ঐটি দেখেই বুঝ্‌তে পারে তা'রা কত রাস্তা চলেছে—আর তাদের কত রাস্তা যেতে হবে। এই পাথরখানায় ইংরাজী অক্ষরে লেখা আছে, উনিশ। সেখানা জানাচ্ছে কল্‌কাতা হ'তে এ জায়গাটা উনিশ মাইল।" ঈশ্বরচন্দ্র ধারাপাত পড়বার সময় পড়েছিলেন একের পিঠে নয় উনিশ। তাই তিনি বাবাকে বল্‌লেন, "তা হ'লে বাবা, এই বাঁ দিকের অংকটি ১, আর ডান দিকের অংকটি ৯?" বাবা বল্‌লেন—"ঠিক বলেছ।" তারপর আবার পথ চল্‌তে লাগ্‌লেন। ১০ নম্বরের মাইল-ষ্টোনের কাছে এসে ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে বল্‌লেন, "বাবা, আমি ইংরাজী অংক সব শিখে ফেলেছি। এই দেখুন বাঁয়ের

অংকটি ১, আর ডাইনের অংকটি ০—বাংলার শূন্যর মতোই। বালকের মুখে এই কথা শুনে কালীকান্তের আর ঠাকুরদাসের যে কত আনন্দ হয়েছিল, তা আর তোমাদিগকে কি বল্‌বো!

কিন্তু ঠাকুরদাসের সন্দেহ গেল না। তিনি মনে করলেন, হয়তো ঈশ্বর চালাকি করে' এই কথা বল্‌ছে। তিনি আর কিছু না বলে' এক জায়গায় দেখ্‌লেন রাস্তার ধারে ঝোপের মধ্যে ৬ নম্বরের মাইল-ষ্টোনটি রয়েছে। সেটি না দেখিয়ে পরের মাইল-ষ্টোনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলতো বাবা ঈশ্বর, এটায় কি লেখা আছে?" ঈশ্বরচন্দ্র বল্‌লেন, "বাবা এটা ৬ হবে—বোধ হয় ভুল করে' এতে ৫ খোদা আছে।" তখন কালীকান্ত আর ঠাকুরদাসের আনন্দ দেখে কে! দু'জনেই বলে' উঠ্‌লেন, "ঈশ্বর, তোমার ইংরাজী অংক শেখা হয়েছে—আমরা ইচ্ছে করেই তোমাকে ঝোপের মাঝে ৬এর মাইল-ষ্টোনখানা দেখাই নি; এটা ৫-এর অংকই ঠিক।" এই রকম করে' সেদিন তাঁরা প্রায় সন্ধ্যের সময়ে কল্‌কাতায় এসে পৌঁছলেন।

ঠাকুরদাস তখন থাক্‌তেন বড়বাজারে জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়ীতে। উঠ্‌লেন তাঁরা চার জনে সেই বাড়ীতে। ঠাকুরদাস জগদ্দুর্লভ সিংহ মশাইয়ের কাজকর্ম দেখা-শুনা করতেন। সকাল বেলায় তিনি কতকগুলি ইংরাজী বিল 'ঠিক' দিচ্ছিলেন। কাছে বসে' ঈশ্বর বাবার সেই 'ঠিক' দেওয়া দেখ্‌ছিলেন। কৌতূহলী বালক ঈশ্বরচন্দ্র বাবার সেই 'ঠিক' দেওয়া দেখে বলে উঠ্‌লেন—

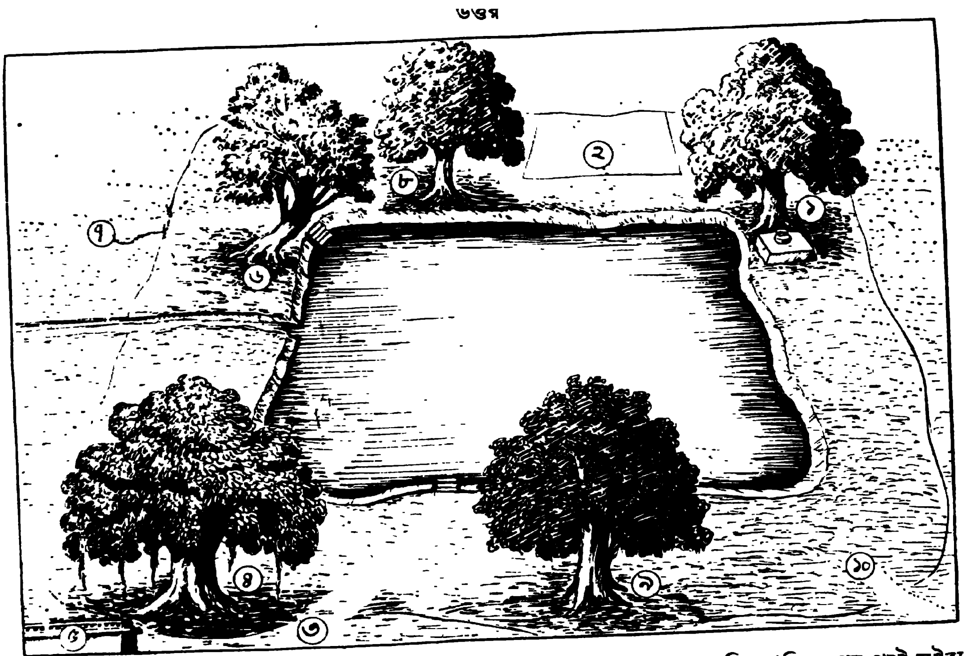
"বাবা, আমি ঐ রকম ঠিক দিতে পারি।" জগদ্দুর্লভ জানেন, ঈশ্বর এখনো ইংরাজী কিছুমাত্র পড়ে নি, তবে সে 'ঠিক' দেবে কেমন করে'। ঠাকুরদাস জগদ্দুর্লভ বাবুকে আগের দিনের মাইল-ষ্টোনের কথা বল্‌লেন। শুনে জগদ্দুর্লভ বাবু ঈশ্বরচন্দ্রকে কয়েকখানি ইংরাজী বিল 'ঠিক' দিতে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যেই সেগুলি 'ঠিক' দিয়ে জগদ্দুর্লভ বাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। জগদ্দুর্লভ দেখ্‌লেন, ঈশ্বরচন্দ্র কোনোখানিতেই ভুল করেন নি। দেখে তাঁর যে কত আনন্দ হয়েছিল, তা না বল্‌লেও চলে। কাজ শেষ হ'য়ে গেলে পর জগদ্দুর্লভ বাবু ঠাকুরদাসকে বল্‌লেন, "কাকাবাবু! ঈশ্বরকে কোনো ভালো স্কুলে ভর্তি করে' দিন্।" ঠাকুরদাস তখন মাত্র ১০৲ টাকা মাইনে পেতেন। তবুও তিনি মাসে ৫৲ টাকা মাইনে দিয়ে ঈশ্বরকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে' দেবার ইচ্ছে জানিয়েছিলেন। এমনি ছিল ঠাকুরদাসের ছেলেকে মানুষ করে' তোল্‌বার প্রবল ইচ্ছা! কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে ঠাকুরদাসের এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজেই ভর্তি করে' দিতে হয়েছিল। শুন্‌লে বাট্‌না-বাটা শিলের গল্প। রাস্তায় এই বাট্‌না-বাটা শিলই ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁর জীবনের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল।

ঠাকুরদাস যে-বাড়ীতে থাকতেন তা'র নিকটেই একটি পাঠশালা ছিল। কল্‌কাতায় এসে ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে সেই পাঠশালায় দিয়েছিলেন। সেখানে তিনমাস পড়্‌বার পর ঈশ্বর-

চন্দ্রের হ'ল রক্তাতিসার রোগ। কল্‌কাতায় ঐ রোগ সার্‌ল না। ঠাকুরদাস বাড়ীতে খবর দিলেন। ঠাকুরমা দুর্গাদেবী খবর পেয়ে কল্‌কাতা এসে ঈশ্বরকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র সাত দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লেন।

বীরসিংহের ছেলেরা খেলা করতো 'শচী বাম্‌নী' নামে একটি বেশ বড় পুকুরের তীরে। ঈশ্বরচন্দ্র এই সময়ে তাঁর সংগীদের সহিত ঐ 'শচী বামনী'র তীরে খেলা করতে যেতেন। একটা মজার গল্প শোন ঃ—তাঁর সংগীদের মধ্যে গদাধর পালই ছিল বয়সে বড়, আর গায়ের জোরেও ছিল সকলের সেরা। কপাটি খেলায় যখন গদাধরের সংগে ঈশ্বরের খেলা হ'ত তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুঁড়ি মেরে গদাধরের দুই পায়ের মধ্যের ফাঁকটায় ঢুকে গদাধরকে চিৎ করে' ফেলে দিয়ে তার বুকের ওপর বসে' হি-হি করে' হাস্‌তেন। ছেলেরাও এই দৃশ্য দেখে তাদের হাসি সাম্‌লাতে পারতো না। সে-সময়ে পড়ে' যেত সেখানে শত বালকের হাত-তালি আর উঠ্‌তো হাসির ফোয়ারা! বাড়ী এসে ঈশ্বর কাটালেন তিন মাস।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরদাস আবার ঈশ্বরচন্দ্রকে কল্‌কাতায় নিয়ে এলেন। এবার আর সংগে লোক আনেন নি। ঈশ্বর বলে-ছিলেন, "বাবা, লোক আর নিতে হবে না—আমি হেঁটে যেতে পারবো।" ছয়ক্রোশ পর্যন্ত এলেন বেশ। গ্রামের নাম পাতুল—মা ভগবতী দেবীর মামার বাড়ী। সেখানে রাতটা কাটিয়ে পর দিন খানিকটা রাস্তা চলে' ঈশ্বরচন্দ্র বসে পড়ে বল্‌লেন—"বাবা, আমি



শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও
শ্রীমান্ অনিলকৃষ্ণ মান্না মহাশয়ের সৌজন্যে]

শচীবামনা পুকুর

[চিত্র পরিচয় পর পৃষ্টে দ্রষ্টব্য
২২ পৃঃ

চিত্র পরিচয়

(১) অশ্বত্থ গাছের নীচে 'মহাপ্রভু' দেবতার স্থান। বিদ্যাসাগর সেবক সমিতির সম্পাদক শ্রীমান্ অনিলকৃষ্ণ মান্না আমাদের জানিয়েছেন—ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলায় অনেক সময়ে এই অশ্বত্থ গাছের ওপরে চড়ে' বসে' থাকতেন। মহাপ্রভুজীর পূজার দিন পুরোহিত মশাই বাতাসা ও ফল-মূল সহ নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজোয় বস্লেই ঈশ্বরচন্দ্র গাছের ওপর থেকে নেমে ঐ নৈবেদ্য হ'তে বাতাসা ও অন্যান্য উপকরণগুলি তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতেন—আর দূরে দাঁড়িয়ে সেগুলি আহার করতেন। কেমন মজার ছেলে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বলো তো!

(২) সংগীদের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের কপাটি খেলার জায়গা।

(৩) শচীবাম্না পুকুরে ঈশ্বরচন্দ্রের স্নানের ঘাট।

(৪) বটগাছ।

(৫) বীরসিংহ ভগবতী মাল্টি পারপাস্ ইনস্টিটিউসন।

(৬) (৮) (৯) অশ্বত্থ গাছ।

(৭) জননী ভগবতী দেবী ও পত্নী দীনময়ী দেবীর স্নানের ঘাট। এই রাস্তা দিয়ে তাঁরা এই পুকুরে স্নান করতে আস্তেন, আর তাঁরা তাঁদের পানীয় জল নিয়ে যেতেন।

(১০) উদয়গঞ্জ যাবার রাস্তা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রন্থভাগে আমরা এই পুকুরের নাম "শচীবামনী" লিখেছি। কিন্তু শ্রীমান্ অনিলকৃষ্ণ মান্না লিখেছেন ঐ পুকুরের স্থানীয় নাম শচীবামনা।

আর চল্‌তে পারবো না—এই দেখ আমার পা ফুলে গেছে ;” এই বলে’ পায়ে হাত বুলোতে লাগ্‌লেন। ঠাকুরদাস কত বুঝালেন—নিকটের গ্রামে তরমুজ কিনে দেবেন বলে’ লোভ দেখালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ’ল না। অনেক বকুনি দিলেন—এমন কি, দু-একটা থাবড়া পর্যন্ত। ঈশ্বরচন্দ্র কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। ঠাকুরদাস বিরক্ত হ’য়ে ছেলেকে সেইখানে ফেলে চলে’ গেলেন। তবু ঈশ্বর তেমনিভাবে বসে’ পায়ে হাত বুলোচ্ছেন—আর কাঁদ্‌ছেন। ঠাকুরদাস আবার ফিরে এসে ঈশ্বরকে অনেক আদর করে’ বল্‌লেন—“চল্‌ বাবা চল্‌—সংগে লোক নিতে যে বারণ করেছিলি, তাই তো লোক নেওয়া হয়নি।” ছেলে তেমনি চুপ করে’ বসে’ আছে দেখে ঠাকুরদাস অগত্যা তাঁকে কাঁধে করে’ চল্‌তে লাগ্‌লেন। এত বড় ছেলেকে কাঁধে করে’ পথ হাঁটা কি সহজ কথা! ঠাকুরদাস হাঁফিয়ে পড়লেন। আবার তরমুজের লোভ দেখালেন। কিন্তু তরমুজের লোভে ঈশ্বরের পায়ের ফুলো কমে নি। যাই হোক, অতিকষ্টে—কখনো কাঁধে, কখনো বা কোলে করে’ আর মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে’ সন্ধ্যের পর ঠাকুরদাস ছেলেকে নিয়ে তাঁর বোনের বাড়ী রামনগরে এসে পৌঁছলেন। সেখানে একদিন বিশ্রাম করে’ পর দিন বৈদ্যবাটীতে এলেন। সেখান হ’তে নৌকো করে’ তাঁরা কল্‌কাতায় পৌঁছলেন।

কল্‌কাতায় অনেকেই ঠাকুরদাসকে বল্‌লেন ঈশ্বরকে ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করে’ দিতে। ঠাকুরদাসেরও তাই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তাঁর বংশের অনেকেই নামজাদা পণ্ডিত। তাঁদের বাড়ীতে সকলেই

টোল খুলে বেশ নাম করেছেন। ঠাকুরদাসেরও পণ্ডিত হ'য়ে টোল খোল্‌বার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গরীব বলে' সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। সেই সময়ে ঠাকুরদাসের এক আত্মীয় সংস্কৃত কলেজে পড়্‌তেন। তাঁরই ভরসা পেয়ে ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজেই ভর্তি করেদিলেন।

সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র

(১)

ইংরাজী ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে' দেওয়া হ'ল। কল্‌কাতার অনেকেই ঠাকুরদাসকে বলেছিলেন, ঈশ্বরকে ইংরাজী পড়াবার জন্যে। ঠাকুরদাসও একদিন জোর গলায় বলেছিলেন—আমি পাঁচ টাকা মাসে মাইনে দিয়ে ঈশ্বরকে হিন্দু কলেজে পড়াবো। মাইনে তো দশ টাকা। পাঁচ টাকা মাইনে দিলে আর পাঁচ টাকায় বাড়ীতে এতোগুলি লোকের চলে কি করে'! এ ভাবনাটা তাঁর ছিলই। তার পর চেপে বস্‌ল আর একটা ভাবনা। তাঁদের পণ্ডিতের বংশ। তিনি না হয় অবস্থা খারাপের জন্যে পণ্ডিত হ'তে পারেননি। কিন্তু তাঁর বাবা, মামা, শ্বশুর, সকলেই যে পণ্ডিত—বাড়ীতে তাঁদের টোল—পণ্ডিত বলে' কত খাতির তাঁদের; এ ভাবনাটাও জুট্‌লো তাঁর মনের মাঝে। তাই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে পড়াবেন স্থির করেছিলেন—অন্য আশা সব ছেড়ে দিয়ে।

কয়েক দিনের মধ্যেই সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকগণ জান্‌তে পারলেন—ঈশ্বরের অসাধারণ শক্তির কথা। ক্ষুরের ধারের মতো তাঁর বুদ্ধি। ধারণা শক্তি এত বেশী যে, দু-একবার পড়লেই তা তাঁর মুখস্থ হ'য়ে যায়—আর কঠিন বিষয়ও চট্‌পট্‌ বুঝে নিতে

পারেন। এই কারণে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই কলেজের শিক্ষক-গণের খুবই আদরের পাত্র হ'য়ে ওঠেন। ঐ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন—গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। তিনি ঈশ্বরের স্মৃতি-শক্তি আর লেখাপড়া শেখ্‌বার অনুরাগ দেখে তাঁকে খুব ভালোবাস্‌তেন। কলেজে ভর্তি হওয়ার ছ-মাস পরে যে পরীক্ষা হয় তা'তে খুব ভালো করে' পাশ করে' ঈশ্বরচন্দ্র ৫৲ পাঁচ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন। ঈশ্বর তো ন-বছরের শিশু। এক্‌লা বড়বাজার হ'তে সংস্কৃত কলেজ (যাতায়াতে প্রায় ৪ মাইল) যেতে-আস্‌তে পারবেন কেন, তাই পিতা ঠাকুরদাস সকাল বেলায় নাইয়ে খাইয়ে ৯ টার সময় বড়-বাজারের বাসা হ'তে বের হ'য়ে ঈশ্বরকে পটলডাঙ্গার কলেজে পৌঁছে দিয়ে নিজের কাজে যেতেন ; আবার ৪ টার সময় কলেজে এসে ঈশ্বরকে বাসায় নিয়ে আস্‌তেন। যখন ঠাকুরদাস বুঝ্‌তে পারলেন যে, ঈশ্বর এর পর এক্‌লা যেতে-আসতে পারছে, তখন হ'তে তিনি আর ঈশ্বরকে কলেজে পৌঁছে দিতে, বা কলেজ হ'তে বাসায় আন্‌বার জন্যে যেতেন না—ঈশ্বর এক্‌লাই একটি ছাতা মাথায় দিয়ে যাওয়া-আসা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র দেখতে বেঁটে-খাটো ছিলেন। এজন্যে ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় যখন চল্‌তেন তখন মনে হ'ত, যেন ছাতাটাই চল্‌ছে। তার মাঝের মানুষটি কারো চোখে পড়্‌তো না। ঈশ্বরচন্দ্রের মাথাটি ছিল আবার দেহের তুলনায় একটু বড় ; এই জন্যে কলেজে তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে 'যশুরে কৈ' বল্‌তো। এখন বলো তো, ছেলের দল ঈশ্বরচন্দ্রকে 'যশুরে কৈ' কেন বলতো ? যশোর থেকে নৌকোর খোলের মধ্যে

জল পুরে আগে কৈ-মাছ আমদানী হ'ত কল্‌কাতায়। যশোর কল্‌কাতা হ'তে অনেক দূর; কাজেই যশোর হ'তে ঐ নৌকো অনেক দিন পরে কল্‌কাতায় এসে পৌঁছতো। বহু দিন ঐ নৌকোর খোলের মধ্যে অল্প জলে থাকায় সেই কৈ-মাছগুলোর মাথাটা একটু বড় হ'য়ে যেতো। ঈশ্বরচন্দ্রের মাথাটা দেহের তুলনায় একটু বড় ছিল বলে' ছেলের পাল তাঁকে 'যশুরে কৈ' বলে' ক্ষেপাতো। কেউ কেউ-বা তাঁকে আরো রাগাবার জন্যে 'যশুরে কৈ' শব্দটিকে একটু উল্টে 'কশুরে যৈ' বল্‌তো। ঈশ্বর-চন্দ্রের রাগের সীমা থাক্‌তো না। তিনি তা শুনে তাদিকে খুবই গালাগালি দিতেন। তোমরা আগেই শুনেছ ঈশ্বরচন্দ্র একটু তোৎলা ছিলেন। তাঁর সেই তোৎলা কথার গালাগালি শুনে ছেলের পাল আরো মজা পেতো। কিন্তু সেই ছোট্ট ছেলেটির রাগে মাথার চুল ছেঁড়া ভিন্ন অন্য উপায়ই বা কি ছিল!

কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিদিন যা পড়তেন বাসায় এসে বাবা ঠাকুরদাসকে তার সমস্তই শোনাতে হ'ত। যদি একটু ভুল হ'ত তা হ'লে ঈশ্বরচন্দ্রকে বকুনি, এমন কি প্রহার পর্যন্ত খেতে হ'ত। শুধু কলেজের পড়াই নয়—ঈশ্বরচন্দ্রকে বাসার কাজও অনেক করতে হ'ত। এইরূপ পরিশ্রমের জন্য ক্লান্ত হ'য়ে তিনি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়তেন। ঘুমন্ত ছেলেকে দেখেই ঠাকুরদাস দিতেন বেদম প্রহার। এই প্রহারের মাত্রা একটু বেশী হ'য়ে গেলে ঈশ্বরচন্দ্র খুব জোরে, কেঁদে উঠ্‌তেন। জগদ্দুর্লভ বাবুর বোনের নাম রাইমণি। ঈশ্বরের কান্না শুনতে পেয়েই রাইমণি

দৌড়ে আস্‌তেন—ব্যাপার কি, দেখ্‌তে। ঈশ্বরের কান্না ও শুকনো মুখ দেখে তিনি ঠাকুরদাসকে খুবই তিরস্কার করতেন। কান্নার মাত্রা বেশী হ'লে রাইমণি বল্‌তেন—"কাকাবাবু এ-রকম করে' ছেলেকে মার্‌লে ছেলে যে ম'রে যাবে—আমাদের বাড়ীতে বেম্মহত্যে হবে—এ আমরা দেখ্‌তে পারবো না। তাই বলি, ছেলেকে যদি এমনি করেই মারেন, তা হ'লে আপনাকে অন্য বাসায় যেতে হবে।" হয়তো রাইমণির এই রকম কথা শুনে ঠাকুরদাসের মনে খুবই দুঃখ হোত, কিন্তু দুঃখ করা ছাড়া তো আর কিছু করবার উপায় ছিল না। ৮৲ টাকা মাইনের কাজ করেন, বাড়ীতে ২।৩৲টাকা পাঠাতে হয়। ৪।৫৲ টাকায় তাঁদের তিন চার জনের দুবেলা খাওয়া দাওয়া চালাতে হয়! কাজেই, অন্য বাসা করতে হ'লে ভাড়া তো দিতে হবে। এখানে যে তাঁরা বিনা-ভাড়ায় থাক্‌তে পেয়েছেন। ঠাকুরদাস আর কিছু বল্‌তে পারতেন না। রাইমণির এই রকম কথা শুনে ঠাকুরদাসের মারের মাত্রাটা দু-চার দিন কম থাকতো বটে, কিন্তু তাঁর এই স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি।

এই রাইমণি ঈশ্বরচন্দ্রকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাস্‌তেন। ঈশ্বরও রাইমণিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌তেন। বাসার রান্নার কাজ করতেন—ঈশ্বরচন্দ্র। ঠাকুরদাস সকাল বেলায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ফেরবার পথে বাজার হ'তে তরি-তরকারী কিনে আন্‌তেন। কোনো কোনো দিন বা ঠাকুরদাসের অবসর হ'য়ে না উঠ্‌লে ঈশ্বরচন্দ্রকেই বাজার করতে যেতে হ'ত। রাইমণি মাঝে মাঝে এসে ঈশ্বরের রান্না-ঘরের কাছে বসে' তরকারী কুটে দিতেন—

বাট্না বেটে দিতেন—উনুন ধরিয়ে দিতেন। ছোট্ট ছেলেটি সেই এঁদো রান্না-ঘরে হাতা বেড়ি-খুন্তির ঠুং ঠাং আওয়াজ করতে থাকেন—আর রাইমণির মাতৃ-হৃদয়ে জেগে ওঠে বেদনার গুঞ্জন। আহা! এই ৯।১০ বছরের বালকের হাতে ভাতের হাঁড়ির বেড়ি! রাইমণির এই বেদনা-বোধে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণে জেগে উঠ্‌তো স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার মন্দাকিনী-ধারা। তাই ঈশ্বরচন্দ্র এক সময়ে বলেছিলেন—"পিতার মুখে মুড়ি-মুড়কীওয়ালীর যে স্নেহের কথা শুনেছি, রাইমণির মাতৃ-হৃদয়ের যে পরিচয় পেয়েছি, এ স্নেহ, এ কোমল হৃদয় পৃথিবীর নয়—স্বর্গের। এই স্নেহের—এই মাতৃ হৃদয়ের কাছে আমার মাথা নুয়ে আসে চিরদিন। আমাকে লোকে স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলুক, তা আমার অপমান নয়—আমার গৌরব-মুকুট। এ মুকুট আমি চিরদিনই মাথায় করে' রাখ্‌তে রাজী আছি।"

এইখানে একটা গল্প বলি শোন। শ্রদ্ধাভাজন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসাগর-চরিতে লিখেছেন—যে ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র দু-বেলা রান্না করতেন, সেই ঘর খানা খুবই অপরিষ্কার ছিল—আর সে ঘর খানায় আলো আস্‌বার জানালার নাম-গন্ধ ছিল না—ঘরখানা ছিল ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। এই জন্যে তার দেওয়ালে থাকতো আরশুলার পাল। আর রান্না ঘরের পাশেই ছিল নর্দামা। তাতে থাক্‌তো শাদা শাদা কৃমির দল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন খেতে বস্‌তেন, তখন নর্দামা হ'তে ঐ কৃমিগুলো বেরিয়ে তাঁর খাবারের থালার কাছে এসে যেতো।

এই জন্যে ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘটি জল নিয়ে খেতে বস্‌তেন। ঐ কৃমির দল তাঁর খাবারের থালার কাছে এসে গেলেই ঈশ্বর সেই ঘটির জল তাদের গায়ে ঢেলে দিতেন। সেই জলের স্রোতে কৃমিগুলো আবার পড়তো নর্দামায়। যাই হোক, কোনোরকমে রান্না সেরে সকলকে খাইয়ে জায়গা পরিষ্কার করে' নিজে খেতে বস্‌তেন। এক দিন কি হয়েছিল জানো? আগেই বলেছি তোমাদের, ঈশ্বরচন্দ্রের রান্না ঘরের দেওয়ালে থাকতো আরশুলার পাল। ঈশ্বর তরকারী রাঁধ্‌ছেন; হঠাৎ একটা আরশুলা সেই তরকারীতে পড়ে' গেল। অন্ধকার ঘরে ঈশ্বর তা দেখ্‌তে পেলেন না। তরকারীর মধ্যে সেই আরশুলাটা রান্না হ'য়ে গেল। সকলে খেতে বসেছেন—ভাত-তরকারী পরিবেষণ করে' দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। নিজের পাত্রেও পরিবেষণ করে' রাখ্‌লেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্রের সৌভাগ্যই বলো, আর দুর্ভাগ্যই বলো—তরকারীর সংগে আরশুলাটা পড়লো তাঁরই থালায়। সকলেই খেতে বসেছেন—ঈশ্বরচন্দ্রও। খেতে খেতে ঈশ্বর দেখ্‌লেন—তাঁর থালায় সেই আরশুলাটা! এই কথাটা প্রকাশ করলে পাছে ঘৃণায় অন্যদের খাওয়া না হয়, এই জন্যে ঈশ্বর-চন্দ্র কাউকে কিছু না বলে' ভাতের সংগে সেই আরশুলাটা গিলে ফেল্‌লেন। খাওয়া শেষ হ'য়ে যাবার পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আরশুলা খাওয়ার কথা শুনে সকলে চম্‌কে উঠেছিলেন। এমনি ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের উপস্থিত-বুদ্ধি।

এইরূপ কঠিন পরিশ্রম করে' প্রায় দু-বছর কেটে গেল। মাঝে ব্যাকরণের একটা পরীক্ষা হয়েছিল। ঈশ্বর সে-পরীক্ষায়

প্রথম স্থান অধিকার করতে পারেন নি। না পারার কারণ এই—সে-বার তাঁদের এক সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। তোমরা জানো, ঈশ্বরচন্দ্র তোৎলা ছিলেন। এই তোৎলামির জন্যে সাহেব ঈশ্বরের সব কথা বুঝ্‌তে না পারার জন্যেই এই ব্যাপার ঘটেছিল। অভিমানী ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করতে না পারায় অভি-মানে সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে দিয়ে বীরসিংহে গিয়ে সেখানকার টোলে পড়বেন, ঠিক করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হ'য়ে ওঠেনি। বাবা ঠাকুরদাস অনেক বোঝালেন—কলেজের শিক্ষকগণও ঈশ্বরকে সব খুলে বল্‌লেন। সব শুনে, বুঝে, সংস্কৃত কলেজেই তিনি আবার পড়তে লাগ্‌লেন।

কিছুদিনের পরেই হ'ল ব্যাকরণের শেষ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় তিনি সর্বপ্রথম হ'য়ে পেলেন আবার একটা জল-পানী। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা এমন শিখেছিলেন যে, আমরা বাংলা ভাষায় যেমন কথা বলি, তিনি সংস্কৃত ভাষায় তেমনি অনর্গল কথা বল্‌তে পারতেন। এই ব্যাপার দেখে সকলে তাঁকে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌লো! এই সময়ে তাঁর বয়স ১১ বছর কয়েক মাস।

(২)

ব্যাকরণ পড়া হ'য়ে গেল। এবার সাহিত্যের পড়া। এগারো বছরের ছেলে সাহিত্যের শ্রেণীতে! সাহিত্যের অধ্যাপক জয়-গোপাল তর্কালংকার আপত্তি তুল্‌লেন—"এগারো বছরের ছেলে সাহিত্যের কি বুঝ্‌বে? তাকে ও-ক্লাসে নেওয়া হবে না।" শুনেই সিংহ-বিক্রম ঈশ্বরচন্দ্র কি বলেছিলেন, জানো? তিনি

তর্কালংকারকে বলেছিলেন—"সাহিত্যেই আমাকে পরীক্ষা করে' নিন্; তা না হ'লে এই কলেজে আমার পড়া হবে না।" ঈশ্বরের এই কথা শুনে অধ্যাপক তর্কালংকার ভট্টি কাব্যের কয়েকটি কবিতার অন্বয় ও অর্থ করতে বল্‌লেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে রকম ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা শুনে তর্কালংকার অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলেন। ব্যাখ্যা শুনে ঈশ্বরকে সাহিত্যের শ্রেণীতে ভর্তি করতে আর তাঁর কোনো আপত্তি রইলো না। বিনয় ও পারদর্শিতা গুণে ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি বরাবর ছেলের মতোই ভালোবেসেছিলেন। মদনমোহন তর্কালংকার ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। এঁর কথা তোমাদিগকে পরে শোনাবো।

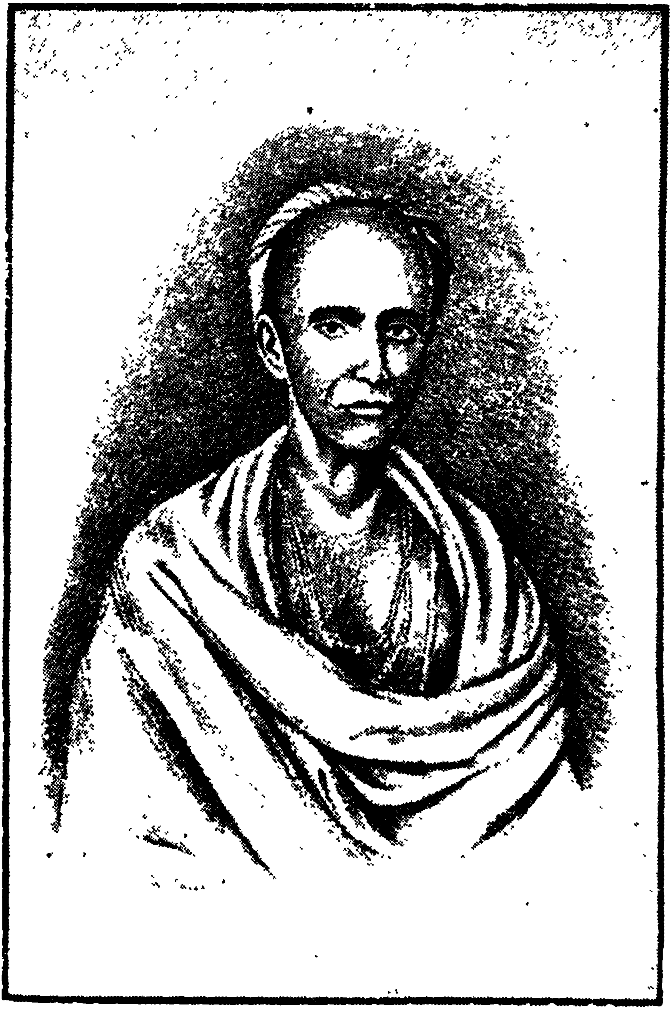
ঈশ্বরচন্দ্র সকল সময়েই নিজের উপর খুব ভরসা রাখ্‌তেন। এ-সম্বন্ধে একটা গল্প শোন। আগেই তোমরা শুনেছ, তিনি যা ধরতেন, তা সহজে ছাড়তেন না। স্নান করতে হবে। যদি সেদিন তাঁর স্নান করবার ইচ্ছে না হোত, সেদিন তাঁকে কিছুতেই স্নান করাতে পারা যেত না। বৃষ্টি-বাদ্‌লার দিন ঠাকুরদাস চালাকি করে' বল্‌তেন, "ঈশ্বর আজ তোমাকে স্নান করতে হবে।" ঈশ্বরচন্দ্র অমনি বলে' উঠতেন—"না বাবা, আজ স্নান করা হবে না।" ঠাকুরদাসের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হোত। স্নান করতে গঙ্গার ধারে গেছেন, হঠাৎ ঈশ্বর বেঁকে বস্‌লেন—স্নান করবেন না। ঠাকুরদাস জোর করে' টেনে জলে নামিয়ে নিতেন। ঈশ্বর কিন্তু ডুব না দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে থাক্‌তেন। ঠাকুরদাস দিতেন তখন দু-চারটে থাব্‌ড়া। ঈশ্বর কাঁদ্‌তে আরম্ভ

করলে ঠাকুরদাস বিরক্ত হ'য়ে বলতেন, সাধে কি বাবা তোকে "এঁড়ে বাছুর" বলে'গেছেন! কাপড়গুলো খুব ময়লা হ'য়ে গেছে— ধোপাবাড়ী দিতে হবে। ঠাকুরদাস বললেন—"ঈশ্বর, আজ এই ময়লা কাপড় খানা পরেই কলেজে যাও।" শুনেই ঈশ্বর করতেন কি জানো? তাঁদের দু-এক খানা বেশী কাপড় একটা ভাঙা বাক্সের ভিতর থাক্‌তো; ঈশ্বরচন্দ্র তখ্‌খনি সেই বাক্স হ'তে পরিষ্কার কাপড় বের করে' পরে' কলেজে যেতেন; দেখে ঠাকুরদাস নিজের ইচ্ছেমতো কাজ হয়েছে জেনে মনে মনে খুব আনন্দ বোধ করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলা হ'তে শেষ বয়স পর্যন্ত নিজে যা ভালো বলে' বুঝ্‌তেন তাই করে' গেছেন। তিনি জীবনে কখনো কারো কাছে মাথা নীচু করে' চলেন নি।

ঈশ্বরচন্দ্র পড়েন সাহিত্য-শ্রেণীতে। এক বছর, দু-বছর হ'য়ে গেছে; দু-বারেই তিনি পরীক্ষায় প্রথম হ'য়ে পুরস্কার ও বৃত্তি পেয়েছেন। তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষাতেও তিনি সকলকে ছাড়িয়ে হ'লেন প্রথম। যে-সব ছাত্র সাহিত্যের পরীক্ষায় এবার ঈশ্বরকে হারিয়ে দেবেন বলে' প্রাণপাত করে' পড়ছিলেন, তাঁদের দশা কি হ'ল তা বোধ হয় তোমরা বুঝ্‌তে পারো। এবারেও তিনি পেলেন পুরস্কার ও বৃত্তি। এই বৃত্তির টাকা ঠাকুরদাস জমিয়ে রাখ্‌তেন—একটা আশায়। ঈশ্বর পণ্ডিত হ'য়ে তাঁদের বীরসিংহের বাড়ীতে টোল করবেন—নানা জায়গা হ'তে ছাত্রেরা এসে তাঁর টোলে পড়বে। টোলের খরচা চালাবার জন্যে ঠাকুরদাস ইচ্ছে

করেছিলেন, তাই দিয়ে কিছু জমি-জায়গা কিনে রাখবেন। তার আয় হ'তে সেই টোল চল্‌বে। এই জন্যে ঠাকুরদাস সেই টাকা দিয়ে কিছু জমি কিনে ফেল্‌লেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যের পরীক্ষায় পাশ হয়েছেন। বীরসিংহের বাড়ীতে এসেছেন। সংস্কৃতে তিনি মহাপণ্ডিত। সংস্কৃত গদ্য-পদ্য দু-রকমই রচনা কর্‌তে পারেন—পণ্ডিত-সভায় সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা করতে পারেন। কোনো ভদ্র লোকের বাড়ীতে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-পত্র রচনা করে' দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। যে-সব পণ্ডিত এসেছিলেন, তাঁরা সেই নিমন্ত্রণ-পত্র খানার লেখার চতুরতা দেখে, কে সেই নিমন্ত্রণ-পত্র লিখেছেন, খোঁজ করেন। তাঁরা যখন জান্‌তে পারলেন একটি চৌদ্দ-বছরের ছেলে সেই পত্র লিখেছেন তখন তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রকে ডেকে কাছে বসিয়ে কত আদর করেছিলেন। তার পরে চারদিকে ঈশ্বর পণ্ডিতের নাম বেজে উঠ্‌লো। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স এই সময়ে মাত্র চৌদ্দ বছর। ক্ষীরপাই-নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য, ঠাকুরদাসের কাছে এসে তাঁর আট বছরের সুন্দরী কন্যা দীনময়ী দেবীর সহিত ঈশ্বরের বিবাহ দেবার ইচ্ছে জানালেন। ঠাকুরদাসেরও ইচ্ছে জাগ্‌ছিল ঈশ্বরের বিবাহ দেবার। ঠাকুরদাস রাজী হ'লেন। কিছু দিন পরেই ঐখানেই তাঁর বিয়ে হ'য়ে গেল। সাহিত্য-শ্রেণীতে যখন ঢুক্‌লেন তখন হয়েছিল তাঁর পৈতে, আর সেই শ্রেণী হ'তে যখন পাশ করে' বেরুলেন, তখন তাঁর হ'ল বিয়ে। খুব মজার কথা, নয়? চৌদ্দ বছরের ছেলে আর আট বছরের মেয়ের বিয়ে শুনে তোমরা হাস্‌ছো, নিশ্চয়। কিন্তু সেই সময়ে



পিতা—ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৪ পৃঃ

তাই হ'ত। ঈশ্বরের এই বিয়েতে একটা মজার গল্প আছে। গল্পভাগে তোমাদের তা শোনাবো।

(৩)

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স এখন ১৫ বছর। ভর্তি হ'লেন তিনি এবার অলংকার-শ্রেণীতে। ঐ শ্রেণীর অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। কলেজের সব অধ্যাপকই ঈশ্বরকে ভালো করে'ই জান্তেন—ঈশ্বরের গুণপনা জেনে—ঈশ্বরের সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতার কথার পরিচয় পেয়ে। তর্কবাগীশ মশাই খুব যত্ন করে' পড়াতে লাগ্‌লেন ঈশ্বরচন্দ্রকে। অলংকার বোঝা খুব কঠিন হ'লেও ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর মেধা শক্তি ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের পড়াবার কৌশলে শীঘ্রই বুঝে নিতে পার্‌তেন। এই সময়ে তাঁকে পড়্‌তে হ'ত সাহিত্যদর্পণ, রসগঙ্গাধর প্রভৃতি শক্ত শক্ত বই। কাজেই মেহনত করতে হ'ত অনেক। এই মেহনতেরউপরে বাড়্‌লো আবার একটা মেহনত। ঈশ্বরচন্দ্রের মেজ ভাই দীনবন্ধু এলেন সংস্কৃত কলেজে পড়বার জন্যে বাবার সংগে বীরসিংহ হ'তে কল্‌কাতায়। তোমরা জানো—বাসায় রান্নার কাজ প্রায় তাঁকেই কর্‌তে হ'ত। ঠাকুরদাসের কাজ এখন খুব বেড়েছে—তিনি এ-সব কাজে প্রায়ই সময় পান না। ঠাকুরদাসের মাইনে তো বেশী নয়। এত অল্প আয়ে চাকর রাখাও অসম্ভব। এই জন্যে ঈশ্বরচন্দ্রকে রান্নাঘর পরিষ্কার করা, উনুন ধরানো, তরকারী কোটা, বাট্‌না বাটা, রান্না করা, রান্নার পর সকলকে খাওয়ানো, পরিবেষণ করা,—আবার খাওয়া শেষ হ'লে জায়গা পরিষ্কার করা, তার পর এঁটো বাসনমাজা পর্যন্ত সব

কাজই কর্‌তে হ'ত। এ-সব কাজে মেহনত খুব বেশী, তারপর আছে পড়ার মেহনত। ঈশ্বরচন্দ্র অসুখে পড়্‌লেন। কল্‌কাতায় অসুখ কিছুতেই সারে না—অগত্যা আস্‌তে হ'ল বীরসিংহে। সেখানে তিনি ভালো হ'লেন ঘোলের সংগে ওল সিদ্ধ খেয়ে। শুনে হাস্‌ছো নিশ্চয়। কিন্তু তখন পাড়াগাঁয়ের লোকে টোট্‌কা ওষুধেই অনেক সময়ে সেরে উঠ্‌তো।

অল্প দিনের পরেই তাঁকে কল্‌কাতায় আস্‌তে হ'ল। আবার সেই কাজ! তিনি খুবই কাহিল হ'য়ে পড়্‌লেন। কিন্তু উপায় তো ছিল না। ভাই দীনবন্ধু আছেন বটে; কিন্তু ঘেঁষ্‌তেন না রান্নাঘরে। তবে মাঝে মাঝে বাজারে যেতেন বটে জিনিষ-পত্র কেন্‌বার জন্যে। একদিন দ।নবন্ধু সন্ধ্যের পর গেছেন বাজারে কিছু জিনিষ কিনে আস্‌তে। রাত্রি ১১টা বেজে গেল, তবু দীনবন্ধু ফির্‌লেন না। ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন ভাইয়ের জন্যে। বের হ'লেন ভাইয়ের সন্ধানে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পেলেন দীনবন্ধুকে নূতন-বাজারে—একটা দোকানের পাশে দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। তাঁকে জাগিয়ে ধরে' নিয়ে এলেন রাত্রি ১২টার পরে, বাসায়। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাই-ভগিনীদের উপর ভালোবাসা ছিল এত বেশী।

এইবার একটা গল্প বলি, শোন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি সংস্কৃত কলেজের একজন মহাপণ্ডিত অধ্যাপক। তাঁর সংগে কোনো একটা বিষয়ের পরামর্শ করবার জন্যে গেছেন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন তাঁর বাড়ীতে। শুন্‌তে পেলেন সেখানে—সাহিত্য দর্পণের আবৃত্তি। দেখ্‌লেন, একটি ছেলে সাহিত্যদর্পণ পড়্‌ছে

দেখেই তর্কপঞ্চানন তর্কবাচস্পতিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, এত ছোট ছেলে সাহিত্যদর্পণের কি বুঝ্‌বে? তর্কবাচস্পতি মশাই তর্কপঞ্চাননকে বলেছিলেন, ছেলেটি কেমন শিখেছে, একবার জিজ্ঞাসা করে' দেখুন না। তর্কপঞ্চাননের সংগে ঈশ্বরের আলোচনা হ'ল। তর্কপঞ্চানন ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বুঝ্‌লেন—ঈশ্বরচন্দ্র এক অসাধারণ পণ্ডিত। পরে তিনি তর্কবাচস্পতিকে বলেছিলেন—এই ছেলেটির জোড়া বাংলা দেশে আর কেউ থাক্‌বে না। সংস্কৃত-জ্ঞান এত ছোট ছেলের, তা আমি এর আগে দেখিনি। তর্কবাচস্পতি এর উত্তরে কি বলে-ছিলেন, জানো? তিনি বলেছিলেন—"আমরা এই বালককে কলেজের মহামূল্য অলংকার-স্বরূপ মনে করি।" সেইদিন হ'তে তর্কপঞ্চাননের দৃষ্টি পড়েছিল—ঈশ্বরচন্দ্রের দিকে।

(৪)

সাহিত্যের পাঠ হ'য়ে গেল—ঈশ্বরচন্দ্রের। সংস্কৃত কলেজের তখনকার নিয়ম অনুসারে অলংকারের পাঠ শেষ করে' ছাত্রদিগকে পড়তে হ'ত ন্যায়, বেদান্ত; তার পরে স্মৃতি-শাস্ত্র। স্মৃতি-শাস্ত্রের পরীক্ষায় পাশ হ'লে ছাত্ররা জজ পণ্ডিতের পদ পাবার উপযুক্ত হতেন। ঈশ্বরচন্দ্র জজ পণ্ডিত হবার আশায় অলংকার শ্রেণীতে পড়বার সময়েই কলেজের অধ্যক্ষের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র পড়বার অনুমতি পেয়ে তিনি অলংকার ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রই একসংগে পড়্‌তে লাগ্‌লেন। দুটো বিষয় এক সংগে পড়া যে কত কঠিন ব্যাপার, তা তোমরা বোধ হয় বুঝ্‌তে পারো। রীতিমত হাড়ভাঙা

পরিশ্রম দু-তিন বছর কর্‌তে পার্‌লে তবে স্মৃতিশাস্ত্রে পাশ করা যায়। কিন্তু তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে, ঈশ্বরচন্দ্র ছমাস পড়েই 'ল-কমিটির' পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স এখন সতের বছর। এত অল্প বয়সের ছেলে 'ল-কমিটির' পরীক্ষায় পাশ করেছে, এ কিন্তু সকলে বিশ্বাস কর্‌তে পারে নি। কিছুদিন পরে ত্রিপুরায় জজ পণ্ডিতের পদ খালি হ'য়। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পদ পাবার জন্যে আবেদন করলেন। নিয়োগ-পত্রও এল। কিন্তু পিতা ঠাকুরদাস কলকাতা হতে এত দূরে ঈশ্বরকে পাঠাতে রাজী হন নি—তাই তাঁর সে চাকরী করা হ'ল না। দেখলে, কেম্‌ন পিতৃভক্ত বালক!

(৫)

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স হয়েছে এখন উনিশ বছর। ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তর শ্রেণীতে এসেছেন। এশ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন—শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি। ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। ঈশ্বরের অগাধ শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে গৌরব করে' ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন, বাবা, তুমি শুধু পণ্ডিত নও—তুমি ঈশ্বর।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের নিয়ম অনুসারে স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত শ্রেণীর শেষ পরীক্ষায় ছাত্রদিগকে গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনার পরীক্ষা দিতে হ'ত। যাঁর লেখা ভালো হ'ত তিনি প্রত্যেক বিষয়ে একশ টাকা পুরস্কার পেতেন। সে-বার ঐ রচনার পরীক্ষা; ছেলেরা পরীক্ষা দিতে এসেছে। পরীক্ষা আরম্ভ হবে। অলংকার

শ্রেণীর অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ঈশ্বরচন্দ্রকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে পেলেন তাঁকে সংস্কৃত কলেজের এক জায়গায়। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে ধরে নিয়ে এসে বল্‌লেন—পরীক্ষা না দিলে মার্শেল সাহেব রাগ করবেন। এই বলে' তিনি পরীক্ষার হলে বসিয়ে প্রশ্নপত্র খানা হাতে দিয়ে বল্‌লেন, 'লেখ।' ঈশ্বরচন্দ্র রচনা লেখায় তাঁর অক্ষমতার কথা বার বার জানালেন। তর্কবাগীশ বল্‌লেন—দেরী কোরো না—লিখে ফেল। ঈশ্বরচন্দ্র বল্‌লেন—কি লিখ্‌বো? সে-বার রচনার বিষয় ছিল—"সত্য-কথনের মহিমা।" ঈশ্বর খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে আবার বল্‌লেন—কি "লিখ্‌বো ?" তর্কবাগীশ বল্‌লেন—লেখ, সত্যং হি…, আর কিছু না বলে' চলে' গেলেন তিনি সেখান থেকে। ঈশ্বরচন্দ্র আরম্ভ করলেন লিখ্‌তে তর্কবাগীশের কথা মতো—'সত্যং হি' ব'লেই। ১টার সময় গদ্য রচনার উত্তর-পত্র দিলেন। পরেই এল হাতে পদ্য রচনার প্রশ্নপত্র। সংকোচ একটা কেটে গেছে। ঈশ্বরচন্দ্রের কলম চল্‌লো হু হু করে'—গঙ্গাধারার মতো। অল্পক্ষণ পরেই তিনি পদ্য রচনার উত্তর-পত্র দিয়ে বেরিয়ে এলেন। বলা বাহুল্য যখন পরীক্ষার ফল বের হ'ল—জানা গেল, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাই সকলের চেয়ে ভালো হয়েছে, আর তিনি প্রত্যেক বিষয়ে একশ টাকা করে' দু-শ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

পর বৎসর ন্যায় ও দর্শনের পরীক্ষা দিলেন। সে বছরে ঐ ঐ বিষয়ের পরীক্ষায় সকলের উপরে হওয়ায় এবং কবিতা রচনায়ও তিনি সকলের চেয়ে ভালো হওয়ায় আবার পুরস্কার পেলেন আরো

দু-শ টাকা। এই ৪০০৲ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র পিতা ঠাকুরদাসের হাতে দিলেন। মাসে ২৲ টাকা মাইনের যিনি চাকরীতে ঢুকেছিলেন, তিনি তাঁর ছেলের পুরস্কারের ৪০০৲ টাকা আজ পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন।

(৬)

কলেজের অধ্যাপকগণ সকলেই ঈশ্বরের এইরূপ কৃতিত্ব দেখে তাঁকে ছেলের মতো ভালোবাস্‌তেন। এ ছাড়া সেই সময়ের পণ্ডিতই বলো, আর কোনো বড়লোকই বলো, যাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত পরিচিত হ'তেন তাঁরা সকলেই তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। বেদান্তের অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি তাঁকে ছেলে ও বন্ধুর মতো দেখ্‌তেন। ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁর যথেষ্ট সেবা-যত্ন কর্‌তেন। বাচস্পতি মশাই ঈশ্বরচন্দ্রের গুণপনা দেখে তাঁকে খুব আদর কর্‌তেন। এমনো হয়েছিল তাঁর, বেদান্ত পড়াবার সময়ে মনে কোনো সন্দেহ জাগ্‌লে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সংগে সে-বিষয় নিয়ে আলোচনা কর্‌তেন। ঈশ্বরচন্দ্র সে-বিষয়ে যেরূপ ব্যাখ্যা কর্‌তেন, তা'তে তিনি তাঁর মনের মতো মীমাংসা পেয়ে কত যে খুসী হ'তেন, তা আর কি বল্‌বো। বাচস্পতি আনন্দে দিশাহারা হয়ে তখন বল্‌তেন—ঈশ্বর, তুমি মানুষ নও—তুমি ঈশ্বর।

যে-সময়ের কথা বল্‌ছি, সেই সময়ে বাচস্পতি মশাই প্রায় বুড়ো হ'য়ে পড়েছেন। সেই সময়ে তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। বাচস্পতি ছিলেন—স্বনামধন্য রামদুলাল সরকারের বংশধর ছাতুবাবুদের সভাপণ্ডিত। বাচস্পতি মশাইয়ের সেবা-যত্নের ত্রুটি

হচ্ছিল দেখে তাঁরা তাঁকে সেই বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করতে পরামর্শ দিলেন। বাচস্পতি এ-বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মত কি, জানতে চাইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু এই নিষেধে কোনো ফল হয় নি। অল্পদিনের মধ্যেই সেই প্রায় ষাট বছরের বুড়ো একটি বালিকাকে নিয়ে এলেন বিয়ে করে'। নূতন বৌ বাড়ীতে এসেছে। বাচস্পতি মশাই বল্‌লেন—ঈশ্বর, তোমার নতুন মাকে একবার দেখ্‌তে যাবে না? এই বলে' দেখ্‌তে যাবার জন্যে একদিন খুবই জেদ করায় অগত্যা ঈশ্বরচন্দ্র রাজী হ'লেন। বাচস্পতি মশাইয়ের সংগে তাঁকে তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে। সংগে টাকা নেই—নতুন মাকে দেখ্‌তে হ'লে প্রণামী টাকা চাই তো। কর্‌লেন কি জানো? কলেজের দারোয়ানের কাছ থেকে দুটি টাকা চেয়ে নিয়ে গেলেন বাচস্পতি মশাইয়ের সংগে। বাচস্পতি বৌ দেখালেন। সেই কচি বৌকে দেখে ঈশ্বরচন্দ্র হাউ হাউ করে' কেঁদে উঠ্‌লেন—বালিকার ভবিষ্যৎ ভেবে। ঈশ্বরচন্দ্র সেই টাকা দুটি তাঁর নতুন গুরু-মার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে' চলে' গেলেন বাইরের ঘরে। ঈশ্বরচন্দ্রের সেদিন কী কান্না! যাই হোক, অনেক বুঝিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে একটু জল খেয়ে যেতে বল্‌লেন, বাচস্পতি। তার জবাবে তিনি কি বলেছিলেন, জানো? ঈশ্বরচন্দ্র তখ্‌খনি বলেছিলেন —"এ ভিটেয় আর জলস্পর্শ কর্‌বো না।"—এই বলে'ই চলে' এসেছিলেন তাঁর বাসায়। এম্‌নি ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের দরদী প্রাণ! তিনি বাচস্পতি মশাইয়ের বাড়ী হ'তে ফিরে এসে কিছুদিন কেবল

তাঁর গুরু-মার ভবিষ্যৎ ভেবে মন-মরা হ'য়ে থাকতেন। আমাদের মনে হয়, এই ঘটনা হ'তেই তাঁর মনে জেগে ওঠে—আমাদের সমাজের এই কু-প্রথা—যার ফলে হাজার হাজার বালিকা নীরবে চোখের জল ফেলে অতি কষ্টে জীবন যাপন কর্‌ছে।

(৭)

সংস্কৃত কলেজে পড়তে বাকী আছে তাঁর ন্যায় আর দর্শন। ন্যায় শাস্ত্র খুব কঠিন শাস্ত্র। এতে পণ্ডিত হ'তে হ'লে অনেক সময় লাগে। কিন্তু শুনে তোমরা আশ্চর্য হবে, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্র দু-বছরের ভিতর পড়ে' ফেলেছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে' পেয়েছিলেন একশ টাকা পুরস্কার। এর আগে তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রও পড়ে' ফেলেছিলেন—একথা তোমাদের বলা হয়নি।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন ন্যায় ও দর্শনের শ্রেণীতে পড়্‌ছিলেন, সেই সময়ে দু-মাসের জন্য তাঁদেরি কলেজে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ খালি হ'ল। ঈশ্বরচন্দ্রই ঐ পদের উপযুক্ত বিবেচনা করে' কলেজের অধ্যক্ষ তাঁকেই ঐ পদে নিযুক্ত করেন। ঐ পদের মাইনে মাসে ৪০৲ চল্লিশ টাকা। ঈশ্বরচন্দ্র দু-মাসের মাইনের ৮০৲ টাকা বাবার হাতে দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন—গয়ায়—তীর্থযাত্রায়।

কিছুদিনের পর ঠাকুরদাস ফিরে এলেন। দেখ্‌লেন তিনি, ঈশ্বরচন্দ্র পেয়েছেন—২৩৩৲ টাকা পুরস্কার আবার। দর্শনের পরীক্ষায় ১০০৲টাকা, সকলের চেয়ে ভালো সংস্কৃত কবিতা লেখার

জন্যে ১০০৲ টাকা, আইন পরীক্ষার জন্যে ২৫৲ টাকা আর ভালো হাতের লেখার জন্যে ৮৲ টাকা। এই টাকাও ঈশ্বরচন্দ্র দিলেন বাবার হাতে—দেনা শোধ কর্‌বার জন্যে।

সংস্কৃত কলেজে যা যা পড়া হ'তে পারে, তার সব পড়াই হ'য়ে গেছে তাঁর। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতিতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। কলেজের কর্তৃপক্ষগণ সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁকে দিলেন "বিদ্যাসাগর" উপাধি—আর দিলেন মহামূল্য এক প্রশংসা-পত্র। সেই প্রশংসা-পত্রে সই করেছিলেন—ব্যাকরণে—গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, সাহিত্যে—জয়গোপাল তর্কালংকার, অলংকারে—প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, বেদান্তে—শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, ন্যায় শাস্ত্রে—জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন, জ্যোতিষে—যোগধ্যান শর্ম্মা, দর্শনে—জয়নারায়ণ তর্কভূষণ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে—শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি প্রভৃতি মহা-মনীষিগণ। তাঁরা ঐ প্রশংসা-পত্রে আরো লিখেছিলেন—

আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে প্রশংসা-পত্র দিতেছি। এই কলিকাতায় শ্রীযুক্ত কোম্পানী-সংস্থাপিত বিদ্যামন্দিরে ১২ বৎসর ৫ মাস কাল অধ্যয়ন করিয়া তিনি উল্লিখিত শাস্ত্রগুলি পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ সকল শাস্ত্রে তাঁহার বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। এই প্রশংসা-পত্র দেওয়া হইল, ১৭৬৩ শকাব্দে, সৌর অগ্রহায়ণ মাসের কুড়ি তারিখে।

ইংরাজী ১০ই ডিসেম্বর
১৮৪৪

শ্রীরসময় দত্ত
সেক্রেটারী

কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর

এতক্ষণ আমরা ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখেছি—বাল্যে দুরন্ত বালক-রূপে—শৈশবে আদর্শ ছাত্ররূপে—কৈশোরে অসাধারণ পরিশ্রমী বিদ্যার্থীরূপে—যৌবনের প্রথম অংকে বীর্যবান, সহৃদয়, কর্ম-যোগীরূপে। এবার আমরা তাঁকে দেখ্‌বো—আদর্শ শিক্ষক-রূপে—ন্যায়নিষ্ঠা ও নির্ভীকতার প্রতিমূর্তিরূপে—দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর-রূপে।

এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ খালি হ'ল। মার্শেল সাহেব যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন হ'তেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে জান্‌তেন, আর তাঁর গুণের কথাও জানা ছিল তাঁর। ঐ পদে তিনি বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্রকে নিযুক্ত করবার জন্যে তাঁর খোঁজ করছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে যেয়ে খবর পেলেন—ঈশ্বরচন্দ্র কল্‌কাতায় নেই—আছেন তাঁর দেশের বাড়ীতে। মার্শেল সাহেব অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চাননকে বল্‌লেন, যে-রকমে পারেন ঈশ্বরচন্দ্রকে এই খবর যেন দেওয়া হয়। তর্ক-পঞ্চানন, ঠাকুরদাসের বাসায় এই খবর পাঠালেন। খবর পেয়েই ঠাকুরদাস গেলেন বীরসিংহে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্রকে কল্‌কাতায় নিয়ে এলেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০৲ টাকা মাইনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হলেন

বিলাত হ'তে যে, সব সিভিলিয়ান এদেশে আস্‌তেন, তাঁদিকে দেশীয় ভাষায় (বাংলা ভাষায়) পাশ করতে হ'ত—তবে তাঁরা চাকরী পেতেন। তাঁদের ঐ পরীক্ষার ভার পড়্‌লো বিদ্যাসাগরের ওপর। তিনি যে-রকম করে' সিভিলিয়ানদের পরীক্ষা করতেন, তাতে অনেকেই 'ফেল' করে' আর চাকরী পেতেন না—হয়তো দেশেও ফিরে যেতে হ'ত। এই জন্যে মার্শেল সাহেব একবার বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—পরীক্ষার আঁটাআঁটিটা একটু কম করতে। তাতে সেই ২১ বছরের যুবক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই বলেছিলেন, কি জানো? তিনি সাহেবের মুখের উপর তখ্‌খনি বলেছিলেন—"ওটি আমাকে দিয়ে হবে না —না হয় চাকরী ছেড়ে দেবো, কিন্তু অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারবো না।" বিদ্যাসাগরের এই সতেজ জবাবে মার্শেল সাহেব খুসী হ'য়েই বলেছিলেন—"তাহ'লে সিভিলিয়ানদের বাংলাভাষার পরীক্ষাটা একটু হাল্‌কা করলে ক্ষতি কি?" বিদ্যাসাগর এতে অসম্মত হন নি।

মাস শেষ হ'য়ে গেল। বিদ্যাসাগর মাইনে পেলেন ৫০৲ টাকা। করলেন কি জানো? সেই টাকা বাবা ঠাকুরদাসের হাতে দিয়ে বল্‌লেন—বাবা, আপনি আমাদের জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন, আমার ইচ্ছে কি জানেন? আমার ইচ্ছে এই, এর পর আপনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে গিয়ে বসুন। আমি মাসে এখন ৫০৲ টাকা মাইনে পাবো। আপনাকে প্রতিমাসে ২০৲ টাকা করে' পাঠিয়ে দেবো—আপনি স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতে পারবেন।

চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে যেয়ে বসা ঠাকুরদাসের ভালো বোধ হচ্ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলের কথাই তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল। 'সাগর'- এর ঢেউয়ে ভেসে গেল ঠাকুরদাসের স্বার্থের আবর্জনা।

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন—ভালো ইংরাজী না জানলে মানুষ এখন আর ঠিক মানুষ হ'তে পারে না—পশ্চিমের চিন্তাধারার সংগে প্রাচ্যের চিন্তাধারার মিল করতে না পারলে শিক্ষা সম্পূর্ণই হবে না। এইটি বুঝে ইংরাজী শিখ্‌বার ইচ্ছা করেছিলেন। এখন তিনি সিভিলিয়ান সাহেবদের বাংলা পড়ান। তাঁদের সংগে সচ্ছন্দে কথা বল্‌তে হ'লে ভালো ইংরাজী জানা চাই। এই জন্যে এখন তিনি ইংরাজী ও হিন্দী শিখ্‌তে লাগ্‌লেন। ইংরাজীর শিক্ষক হয়েছিলেন প্রথমে ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরে ক্রমে ক্রমে রাজনারায়ণ বসু, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, পরে রাজনারায়ণ গুপ্ত তাঁর ইংরাজীর শিক্ষক হন। শেষোক্ত মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫৲ টাকা ও হিন্দীর শিক্ষককে মাসিক ১০৲ টাকা করে' দিতেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হ'য়ে ওঠেন।

তোমাদিগকে আগেই বলেছি বিদ্যাসাগর মাসে মাসে ২০৲ টাকা করে' পাঠান। বাকি তাঁর হাতে থাকে ৩০৲ টাকা। এই ৩০৲ টাকাতেই তাঁদের কল্‌কাতার বাসা-খরচ চলে। দু-জন একজন তো নয়; ন-ন জন। বিদ্যাসাগররা তিন সহোদর,—তিনি নিজে, দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র, দুটি খুড়ো-কালিদাসের ছেলে, দুটি পিস্‌তুতো

ভাই, একটি মাস্‌তুতো ভাই আর তাঁদের বাড়ীর পুরানো চাকর শ্রীরাম। এই ন-জন লোকের খাওয়ার খরচ চালাতে হয় বিদ্যাসাগরকে। তা-ছাড়া বড়বাজারে যে-বাড়ীতে তাঁরা থাক্‌তেন, সেই বাড়ীতে থাকা কষ্টকর হ'ল বলে' তাঁকে বৌ-বাজারে একটা বাড়ী ভাড়া করতে হয়েছিল—তা'র ভাড়াও লাগ্‌তো।

বাসায় যাঁরা থাক্‌তেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের সকলের চেয়ে বড়। আর বাসা-খরচও তিনি চালান। তবু তিনি পালা করে' রান্নার কাজ করতেন, তখন। এমনি হৃদয়বান্‌ পুরুষ ছিলেন তিনি।

আগে সংস্কৃত পড়তে হ'ত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ে'। সেটা পড়তে অনেক সময় লাগে। তাঁর এক বন্ধু তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়্‌তেন। তাঁর নাম রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুগ্ধবোধ পড়ে' সংস্কৃত শিখ্‌তে অনেক দেরী হয়। এজন্যে বিদ্যাসাগর মুগ্ধবোধ তাঁকে না পড়িয়ে এক রাত্রির মধ্যে একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেছিলেন। সেই লেখা হ'তেই উপক্রমণিকা ব্যাকরণ তৈরি হয়েছিল পরে। এই রাজকৃষ্ণ বাবু বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অনুরোধে সংস্কৃত কলেজে জুনিয়ার পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বিদ্যাসাগর কিছু দিনের পর জান্‌তে পারলেন—এক গরীব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঐ জুনিয়ার বৃত্তি পেয়ে সংস্কৃত কলেজে পড়্‌ছেন—রাজকৃষ্ণ বাবু ঐ পরীক্ষায় পাশ করলে তাঁর বৃত্তি বন্ধ হ'য়ে যাবে—তাঁর আর পড়া হবে না জেনে রাজকৃষ্ণ বাবুকে আর জুনিয়ার পরীক্ষা

দিতে দেন নি। এই ব্যাপারে তুই বন্ধুই প্রশংসার পাত্র। রাজকৃষ্ণ বাবু এর পর সিনিয়ার পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌লেন— বিদ্যাসাগরের সাহায্যে।

কাল্‌নার মদনমোহন তর্কালংকার ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু। বন্ধুর জন্যে অনেক চেষ্টা করে' ফোর্টউইলিয়ম কলেজে তিনি তাঁর চাকরী করে' দিয়েছিলেন। এইরূপ আর একটি ব্যাপারের কথা বলি ঃ—বিদ্যাসাগরের এক বন্ধুর নাম তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি। ব্যাকরণে ও অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি একদিন বিদ্যাসাগরকে তাঁর একটা কর্ম-কাজের সুবিধে করে' দেবার জন্যে বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন— এবার কোনো কাজের সন্ধান পেলে আপনার জন্যে চেষ্টা করবো। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ খালি হ'ল। প্রথম পদের মাসিক মাইনে নব্বই টাকা। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্টউইলিয়ম কলেজে ৫০৲ টাকা মাইনে পেতেন। ময়েট সাহেব তাঁকে ঐ পদ দিতে চাইলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বল্‌লেন কি জানো? তিনি বল্‌লেন—ব্যাকরণে খুব পণ্ডিত তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি মশাই; তাঁকেই ঐ পদ দেওয়া হোক। বল তো তিনি কেন ঐ-রকম বলেছিলেন? সেই যে পুরুষ-সিংহ বলেছেন—এবার কোনো কাজের সন্ধান পেলে আপনার জন্যে চেষ্টা করবো। এই জন্যেই তিনি ৫০৲টাকা মাইনের কাজ করলেও শুধু কথা রক্ষা করবার জন্যেই তারানাথের ঐ চাকরী করে' দেবার চেষ্টা করেছিলেন। শুধু চেষ্টা করাই নয়। ব্যাপার

কি হয়েছিল জানো? যে-দিন ময়েট সাহেবের সংগে ঐ-রকম কথা হচ্ছিল, সে-দিন ছিল শনিবার। ময়েট সাহেব বল্‌লেন—আপনি তো তারানাথ তর্ক-বাচস্পতিকে ঐ কাজ দিতে বল্‌ছেন, কিন্তু তিনি তো এখানে নেই—অথচ আমার আগামী সোমবারের মধ্যে লোক ঠিক করা চাই। তা হ'লে অন্তত আগামী পরশু যাতে তাঁর আবেদন-পত্র এসে পৌঁছায় বেলা ১০ টার মধ্যে, তার উপায় করতেই হবে। বিদ্যাসাগর রাজী হ'লেন। তর্কবাচস্পতি তখন থাক্‌তেন—কাল্‌নায়। কল্‌কাতা হ'তে কাল্‌না যে ৬০ মাইল দূরে—কী করে' সোমবারে তাঁর দরখাস্ত এসে পৌঁছায়! এই তাঁর চিন্তা হ'ল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি কর্তব্য ঠিক করে' ফেল্‌লেন। তিনি তখ্‌খনি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে একজন চাকর সংগে নিয়ে বের হ'লেন কাল্‌নার পথে—তর্ক-বাচস্পতির কাছে। সমস্ত দিনরাত পথ হেঁটে তার পর দিন সকালে পৌঁছলেন কাল্‌নায়। তর্ক-বাচস্পতির সঙ্গে দেখা করে', তাঁর সংগে তর্ক-বাচস্পতির হেঁটে আসা সম্ভব নয় বলে' তিনি ঐ পদের জন্যে তর্ক-বাচস্পতির দ্বারা আবেদন-পত্র লিখিয়ে নিয়ে ফিরে চল্‌লেন কল্‌কাতার পথে। কল্‌কাতায় পৌঁছলেন—সোমবার সকাল বেলায়। বেলা ১০টার সময় ময়েট সাহেবকে দিলেন—তর্ক-বাচস্পতির আবেদন-পত্র। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে ব্যাকরণের ১ম শ্রেণীর অধ্যাপক পদে চাকরী হ'য়ে গেল—তর্কবাচস্পতির। শুন্‌লে বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব। তিনি পরের উপকারের জন্যে—নিজের কথা রাখ্‌বার

জন্যে আত্মবলি দিতে পারতেন—আপনার যা-কিছু আছে, তা বিলিয়ে দিতে পারতেন। তাইতো আমরা তাঁকে সিংহ-শিশু বলে' থাকি। সিংহ-শিশুর মতোই বিক্রম ছিল তাঁর। এর পর তাঁরি চেষ্টায় তাঁর দুই বন্ধু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ আর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজে চাকরী পেয়েছিলেন। এমনই ছিল তাঁর বন্ধু-প্রীতি।

তোমরা এর আগে পেয়েছ—বিদ্যাসাগরের পিতৃ-ভক্তির পরিচয়। এবার আমরা তোমাদিগকে তাঁর অদ্ভুত মাতৃভক্তির কথা বল্‌বো। তাঁর ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্রের বিয়ে। মা তাঁকে বাড়ী যেতে লিখেছেন। বিদ্যাসাগর চাইলেন কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের কাছে ছুটি। কলেজে তখন খুবই কাজের ভিড়্—সাহেব ছুটি দিতে চাইলেন না। মনের কষ্টে রাত্রে ঘুম হ'ল না তাঁর—সকাল হ'য়ে গেল। পুরুষ-সিংহ কর্তব্য স্থির করে'ফেলেছেন! তিনি সাহেবের সংগে দেখা ক'রে বল্‌লেন—"মা বাড়ী যেতে লিখেছেন—আমাকে বাড়ী যেতেই হবে। ছুটি যদি দিতে না পারেন, তা হ'লে এই কাজ ছেড়ে দিলাম—মঞ্জুর করুন—আমি বাড়ী যাবো।" এই কথা শুনেই সাহেব তাঁর মার উপর ভক্তির কথা জেনে তাঁকে বল্‌লেন—"তোমাকে কাজ ছাড়তে হবে না—তুমি বাড়ী যাও।" শুনে বিদ্যাসাগরের যে কত আনন্দ হয়েছিল—তা আর কি বল্‌বো। বাসায় এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে সংগে নিলেন তাঁদের চাকর শ্রীরামকে, রওনা হলেন—বীরসিংহের পথে। বর্ষা কাল—শ্রাবণ মাস। পথে কাদা—চলা দায়। বহু



জননী—ভগবতী দেবী—৫০ পৃঃ

কষ্টে এসে পৌঁছলেন—দামোদরের ধারে। দামোদর পার হ'য়ে তাঁকে যেতে হবে। দেখ্‌লেন, শ্রাবণের ধারায় দামোদরের জল-স্রোত চল্‌ছে ভীম গর্জন করতে করতে। পার হবার নৌকো এপারে নেই—ওপারে; হয়তো ও-বেলায় আসবে; আবার আস্‌বে কি-না—তাই-বা কে জানে! ভাব্‌ছেন নদীর ঘাটে বসে'। জেগে উঠ্‌লো তাঁর চোখের সাম্‌নে মায়ের ছল ছল করুণ আঁখি। চকিতে সেই বীরসিংহের সিংহ-শিশু গা ঝাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন দামাল দামোদরের প্রবল জল-স্রোতে। কত লোক কত ভাবে তাঁকে নিষেধ করেছিল, সেরূপ দুঃসাহসের কাজ করতে। কিন্তু মায়ের চিন্তাকাতর মুখচ্ছবি জাগিয়ে তুলেছিল সেই বিরাট্‌ বিশ্বরূপকে। যেরূপে তিনি দেখেছিলেন—মৃত্যুর মাঝে অমৃতকে। বলহীন হন নি তিনি। দুর্ণিবার সাহসে ভর করে' তিনি পৌঁছলেন —অপর পারে।

আবার চলা সুরু হ'ল। সন্ধ্যার পূর্বেই পৌঁছলেন আর এক ভীমকায় নদের তীরে—দ্বারকেশ্বরে। দামোদর পারের নীতিই তিনি ধরলেন। মাতৃভক্তির বর্মে সুরক্ষিত তিনি। মায়ের জয় হ'ল। পথে দস্যুর উৎপাত ছিল। সে ভয়ও কেটে গেল তাঁর—মাতৃ-মন্ত্র-গুঞ্জনে। রাত হ'য়ে গেছে। তেমনি ভিজে কাপড়ে তিনি পৌঁছলেন তাঁর মাতৃক্রোড়ে। এতক্ষণে মায়ের প্রাণ হ'ল উৎসব-মুখর। ছেলের মুখে ফিরে এল আনন্দের জ্যোতি! শুন্‌লে ঈশ্বরের মাতৃভক্তির কথা।

এবার বলি আর একটি কথা :—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যখন বিদ্যাসাগর চাকরী করেন তখন এদেশে এসেছিলেন কতকগুলি সিভিলিয়ান। তাঁরা বিদ্যাসাগরকে খুবই ভালবাসতেন আর সম্মানও করতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'কস্ট্' নামে এক সিভিলিয়ান, তাঁর সংগে বিদ্যাসাগরের খুব সদ্ভাব। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে নানারকম আমোদজনক কথাবার্তাও হ'ত। কস্ট সাহেব একদিন বিদ্যাসাগরকে তাঁর নামে একটি সংস্কৃত কবিতা লিখে দেবার জন্যে অনুরোধ করেন। তিনি তখ্খনি একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে' দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তো সংস্কৃত; তোমরা বুঝবে না। তাই তার বাংলা কবিতায় অনুবাদ করে' তোমাদের শোনাই।

শ্রীমান্ রবার্ট কস্ট্ আসি' এ বিদ্যায়তনে।
তুষ্ট করিলেন মোরে সুমধুর আলাপনে ॥১॥

সদ্‌গুণসম্পন্ন তিনি, সদাচারে সদা রত।
প্রসন্ন-বদন, সুধী—আয়ু হোক্ বর্ষ শত ॥২॥

রবার্ট কস্ট্ শ্লোক দুটির অর্থ বুঝে খুবই খুসী হ'য়ে বিদ্যাসাগরকে ২০০৲ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সে-টাকা নিজে নেন নি। কস্ট্ সাহেবের মত নিয়ে সংস্কৃত রচনার জন্য সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের প্রথম পুরস্কার ৫০৲ টাকা হিসাবে চার বছর দেবার জন্যে কলেজের অধ্যক্ষ মশাইয়ের হাতে দিয়েছিলেন। দেখ্‌লে, কেমন নির্লোভ পুরুষ ছিলেন, তিনি।

এবার তোমাদিগকে দেখাবো—বিদ্যাসাগরের বীরত্বের এক রুদ্রমূর্তি। বিদ্যাসাগর এখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক। একটা বিশেষ কাজে গেছেন হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ কার্ সাহেবের কাছে। সেকালে সাহেবদের দৃষ্টি এদেশের লোকেদের ওপর তেমন ভালো ছিল না। কালা আদ্‌মী বলে' তাঁরা এদেশের লোকদের একটু ঘৃণাও করতেন। কার্ সাহেব বসে' আছেন ইজি চেয়ারে—সাম্‌নের টেবিলের ওপর জুতোশুদ্ধ পা-দুটো তুলে দিয়ে। বিদ্যাসাগর কলেজের কাজেই গেছেন। তিনি তাঁকে বস্‌তে বল্‌লেন না। বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাহেবের সংগে কথাবার্তা ক'য়ে ফিরে এলেন—সংস্কৃত কলেজে। সাহেবের এই ব্যবহারে তিনি অপমানের আগুনে পুড়্‌তে লাগ্‌লেন—অগ্নিগর্ভ পর্বতশৃংগের মতো। এই অপমানের কথা তিনি কিন্তু কাউকেই জানান নি। কয়েক দিনের পরে কার্ সাহেবের বিশেষ একটা কাজ পড়লো বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর তাঁর আফিস-ঘরে বসে' কাজ কর্‌ছেন। খবর পেলেন—কার্ সাহেব এসেছেন। কার্ সাহেবের সেই অভদ্র ব্যবহার তিনি ভোলেন নি। তিনি কর্‌লেন কি জানো? তিনি তাঁর সেই মুখবাঁকা চটি-জুতো-পরা পা-দু'খানি সাম্‌নের টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে কার্ সাহেবের মতোই চেয়ারে হেলান দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় সাহেবকে আফিসের ভিতর আস্‌তে বল্‌লেন। কার্ সাহেবকে বস্‌তেও বল্‌লেন না। বিদ্যাসাগরের এইরূপ ব্যবহারে কার্ সাহেব খুবই অপমান বোধ কর্‌লেন। ভয়ানক চটে' গিয়েছিলেন, তিনি।

তবুও কোনো রকমে কাজ সেরে চলে' গেলেন—হিন্দুকলেজে। শুধু চলে' যাওয়া নয়; আফিসে ফিরে যেয়ে বিদ্যাসাগর যে তাঁর সংগে খুবই অশিষ্ট ব্যবহার করেছেন, তাই জানিয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ময়েট সাহেবের কাছে অভিযোগ কর্‌লেন। বিদ্যাসাগরের কৈফিয়ৎ তলব হ'ল। কৈফিয়তে তিনি বেশ নরম ভাষায় জানিয়েছিলেন—"আমরা—কালা আদমী, ইংরাজীমতে অভ্যর্থনা করতে জানি না, তাই কার্ সাহেব ইংরেজদের অভ্যর্থনা করবার রীতিটা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। আমি ঐরূপ অভ্যর্থনাই শিখেছিলাম—সুসভ্য কার্ সাহেবের কাছে। কার্ সাহেবের কাজ পড়েছিল—তিনি এলেন আমার আফিসে। তাই আমি কার্ সাহেবেরই শেখানো রীতিতে তাঁকে ঐ রূপেই অভ্যর্থনা করেছিলাম। এরূপ অভ্যর্থনা করবার জন্যে দায়ী কার্ সাহেবই। আমি কোনো অন্যায় করেছি বলে' মনে কর্‌তে পার্‌ছি না।

বিদ্যাসাগরের কৈফিয়তে ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরের মনের জোরের পরিচয় পেয়ে খুসীই হয়েছিলেন। তারপর একদিন তিনি কার্ সাহেবের কাছে যেয়ে কার্ সাহেবকে বিদ্যাসাগরের কৈফিয়ৎ শুনিয়ে বিদ্যাসাগরের সংগে এই গোলযোগটা মিটিয়ে নিতে বলেন। পরে একদিন কার্ সাহেব বিদ্যাসাগরের সংগে দেখা করে' বিবাদটা মিটিয়ে নিয়েছিলেন। বলতো জয় হ'ল কার? কার্ সাহেবের, না, আমাদের ন্যাড়ামাথা, চটি-পরা বিদ্যাসাগর মশাইয়ের?

এর আগে বিদ্যাসাগর করেছিলেন সংস্কৃত কলেজে আর একটা কাজ। এখানে সেই কাজের কথাটাই বলি, শোনো। তখন সংস্কৃত কলেজ ছিল একটা বেবন্দোবস্তী মহল। অধ্যাপক বা ছাত্র—কারোর আসা-যাওয়ার সময় নির্দিষ্ট ছিল না। যার যখন ইচ্ছে হ'ত, তখন তিনি কলেজে আস্‌তেন, আবার ইচ্ছে হ'লেই তাঁরা কলেজ হ'তে চলে' যেতেন। তার পর অধ্যাপকরা ঢালা বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে ছেলেদের পড়াতেন, আর সময়ে সময়ে ঘুমিয়েও পড়্‌তেন। বিদ্যাসাগর কয়েক দিনের মধ্যেই সে-সব বন্ধ করে' ১০টা ৪টে কলেজের কাজ হবে—নির্দিষ্ট করে' দিয়েছিলেন। কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলকেই ঠিক দশটার সময় হাজ্‌রে দিতে হ'ত। ছেলেরা যখন-তখন কলেজ হ'তে বেরিয়ে যাবে, সেটাও তিনি বন্ধ করে' দিয়েছিলেন। সকল ছেলেকেই এখনকার মতো কাঠের তৈরি পাস্‌ নিয়ে বাইরে যেতে হ'ত। এক শ্রেণীর হয়তো আট-দশটা ছাত্র আগে বেরিয়ে যেতো ক্লাস থেকে। পাস্‌-এর ব্যবস্থা হওয়ায় সেটাও বন্ধ হ'য়ে গেল। এই রকম করে' বিদ্যাসাগর কলেজের শৃংখলা ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এই ব্যবস্থায় সম্পাদক মহাশয় খুবই খুসী হ'য়ে বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট প্রশংসাই করেছিলেন।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ খালি হয়। ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরকে ঐ পদে নিযুক্ত করবার ইচ্ছে করেছিলেন। কিন্তু ঐ পদের মাইনে বেশী হ'লেও তিনি ঐ পদ নিতে অস্বীকার করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ভিতরকার গলদ

তিনি দূর করবেন, এই তাঁর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তাঁর যে এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। তাই তিনি সেই কাজ নিতে পারেন নি। কোনো কাজ অর্ধ-সমাপ্ত করে' রাখা তাঁর স্বভাব নয়। তিনি ভাব্‌তেন—"সংকল্প করিব যাহা—সাধন করিব তাহা।" তাই তিনি লেগে রইলেন সংস্কৃত কলেজের উন্নতির কাজে। পরিশেষে ময়েট সাহেবকে বলে' ক'য়ে—ঐ পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত জেনে তিনি তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকারকে ঐ চাকরী দিলেন। বন্ধুর ওপর কেমন ভালোবাসা বলতো ?

এইরূপে কিছুদিন কাট্‌লো। সংস্কৃত কলেজের বিধি-ব্যবস্থার যে-রকম পরিবর্তন করছিলেন তিনি, তা নিয়ে সম্পাদক রসময় দত্তের সহিত তাঁর মনোমালিন্য ঘট্‌লো। তাই তিনি একদিন কাজ ছেড়ে দিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত, আর অধ্যক্ষ ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরের কাজে ইস্তফা দেওয়াটা ভালো হয় নি বলে' কত বুঝোলেন। কিন্তু শৈশবের সেই একগুঁয়ে ছেলেটি—বিদ্যাসাগর রূপেও তাঁর গোঁ ছাড়্‌লেন না। বল্‌লেন—"ও ছাই আর করবো না।" বন্ধুদের অনেকেই বুঝোলেন। একজন তাঁকে বলেছিলেন—চাকরী ছেড়ে দিয়ে খাবে কি ? তার উত্তরে সেই স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ বলেছিলেন—"আলু-পটল বেচ্‌বো—মুদীর দোকান করবো, তবু অপমান স্বীকার করে' সে-চাকরী আর করবো না।" অবশ্য এই চাকরী ছেড়ে দেওয়ায় বিদ্যাসাগরের একটু অসুবিধা হয়েছিল। এই অসুবিধা ও অভাব দূর করবার জন্যে মাথায় চাপ্‌লো একটা খেয়াল। বই লিখ্‌বার ইচ্ছে

জাগ্‌লো—তাঁর মনে। তারই জোগাড়-যন্ত্র করছিলেন তিনি। ময়েট সাহেব এক দিন তাঁর সংগে দেখা করে' বল্‌লেন—তোমার তো আর চাকরী নেই। কাজেই সময় আছে অনেক। আমার কয়েকটি বন্ধুকে এক ঘণ্টা করে' বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি পড়াও না। বন্ধুর কথায় বিদ্যাসাগর রাজী হলেন। কয়েক মাস পড়ালেনও। ময়েট সাহেবের বন্ধুরা চাকরী পেয়ে চলে' গেলেন—অন্য জায়গায়। যাবার সময় তাঁরা কয়েক মাসের মাইনে হিসেবে বিদ্যাসাগরকে দিলেন প্রায় চার শত টাকা। বিদ্যাসাগর সে টাকা না নিয়ে বল্‌লেন—ও টাকা আমি নিতে পারি না—আপনারা ময়েট সাহেবের বন্ধু—আর ময়েট সাহেবের সংগে আমারো যথেষ্ট ভালোবাসা আছে। আমি বন্ধুর কাজ করতে এসে টাকা নেবো কি করে' ? টাকা নেওয়া তাঁর আর হ'ল না। বিদ্যাসাগর সে-সময়ে একটু কষ্টে পড়েছিলেন। সে-টাকায় তাঁর অনেক উপকার হ'তে পারতো। কিন্তু মহামানব বিদ্যাসাগর সে-টাকা নিতে পারেন নি—সামান্য শিষ্টতার ক্রটি হবে বলে'। দেখো তো তাঁর মন কত উঁচু—প্রাণটা ছিল কত বড়।

কাজ ছেড়ে দিয়ে প্রায় দু-বছর বসে' আছেন তিনি। চিন্তাও নেই—উদ্বেগও নেই। স্থির করছেন তাঁর ভবিষ্যৎ—পরে কি করবেন তিনি। এমন সময়ে তাঁর পরমহিতৈষী মার্শেল সাহেব ধরে' বস্‌লেন, তাঁকে মেডিকেল কলেজের হেড্‌ রাইটারের কাজ করতে হবে। তাঁর কথা তিনি কাট্‌তে পার্‌লেন না। নিলেন

তিনি সেই পদ। বেতন হ'ল ৮০৲ আশি টাকা। কিন্তু এ-চাকরী তাঁকে বেশীদিন করতে হয়নি।

আবার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ খালি হ'ল। তোমরা পড়েছ, এর আগে বিদ্যাসাগরেরই চেষ্টায় মদনমোহন তর্কালংকার ঐ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন কাজ করবার পর তর্কালংকারের হ'ল পেটের অসুখ। সে-অসুখ আর কিছুতেই সারে না। বাধ্য হ'য়ে তাঁকে সে-চাকরী ছেড়ে দিতে হ'ল। বন্ধু ময়েট সাহেবের উপরোধে তাঁকে ঐ পদ নিতে হয়েছিল সংস্কৃত কলেজে নিয়ম-কানুন চালু করবার কাজ তাঁর অসমাপ্ত আছে মনে করে'। বিদ্যাসাগরের এই চাকরী নেওয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে। কিছুদিনের পরেই কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিলে বিদ্যাসাগরই ঐ পদ পেয়েছিলেন। কিন্তু নূতন নিয়ম অনুসারে অধ্যক্ষ নামের বদলে হ'ল প্রিন্সিপাল। এই সময়ে তাঁর মাইনে হয়েছিল ১৫০৲ টাকা। তারপর আরম্ভ করলেন—তাঁর অর্ধসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে। প্রধান কাজ হ'ল তাঁর সংস্কৃত কলেজের পুরানো হাতের-লেখা পুঁথিগুলি ছাপা।

সংস্কৃত কলেজে অনেক কিছু রদ-বদল করলেন তিনি। তাঁর হৃদয়ে জেগে আছেন যে এক বিরাট্ পুরুষ। অধ্যাপকগণকে ঠিক সময়ে কলেজে আস্‌তে বাধ্য করতে তাঁকে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ, এখন কলেজের কর্তা তিনি। আর বেশীর ভাগ অধ্যাপকের ছাত্রও তিনি। কাজেই, মুখের সাম্‌নে কোনো

অধ্যাপককে তিনি তেমন-কিছু বল্‌তে পারতেন না। করেছিলেন কি জানো? কোনো অধ্যাপক আস্‌ছেন দেখ্‌লেন বিদ্যাসাগর তাঁর ওপর-তলার ঘর হ'তে। দেখেই তিনি সেখান থেকে নেমে এসে কলেজের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে সেই অধ্যাপককে বল্‌তেন "এই এলেন নাকি?" লজ্জা পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই অধ্যাপকদের ঠিক-সময়ে-না-আসা দোষটা কেটে গেল। অনেকদিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর পারেন নি তাঁর বুড়ো শিক্ষক জয়গোপাল তর্কপঞ্চাননের এই দোষটা কাটাতে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তর্কপঞ্চাননও ঠিক সময়ে আস্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন—নীরব তাড়নায়।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে নিয়ম ছিল—কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় ছেলেরাই পড়্‌তে পার্‌বে। বিদ্যাসাগর এটা তুলে দিয়ে নিয়ম করলেন—সকল জাতের ছেলেরাই সংস্কৃত কলেজে পড়্‌তে পার্‌বে। এতে বিরোধী পক্ষ খুব হৈ-চৈ করলেও শেষে মহারথী বিদ্যাসাগরেরই জয় হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ভবিষ্যৎ ভেবেই এর পর যারা সংস্কৃত কলেজে নূতন ঢুকবে—তাঁদের মাইনে দিতে হবে—এই নিয়ম করেছিলেন। এতেও হৈ-চৈ কম হয় নি। এইরকম নিয়ম কেন করা হ'ল, তিনি সেই হৈ-চৈ যারা করেছিল, তাদের ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সময়ে তিনি কয়েকখানি বইও লিখেছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার সুবিধা হবে বলে' এর আগে তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুকে সংস্কৃত পড়াবার জন্যে এক রাত্রির মধ্যে একখানি বই লিখেছিলেন —তার নাম উপক্রমণিকা। এখন তিনি সেই বইখানি ছাপার

অক্ষরে বের করলেন। আর সরল সংস্কৃত পড়বার জন্যে পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ, মহাভারত প্রভৃতি বই হ'তে বিষয়-বস্তু নিয়ে ঋজুপাঠ নাম দিয়ে তিনখানি বইও এইসময়ে ছেপেছিলেন। এই সব বই পড়ে' ছেলেরা অল্প সময়ের মধ্যে কাজ-চালান গোছ সংস্কৃত শিক্ষা করতে পারতো।

কল্‌কাতায় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়ে। ছেলেদের পড়াশুনা করতে খুব কষ্ট হয় এই সময়ে। এইজন্যে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে' বিদ্যাসাগর প্রায় দু-মাস গ্রীষ্মের ছুটির নিয়ম করেন। এই নিয়মটা এখনো চলে' আস্‌ছে।

সংস্কৃত কলেজের নানারকম উন্নতি হয়েছিল বিদ্যাসাগরেরই চেষ্টায়। কর্তৃপক্ষ এর পরিচয় পেয়ে তাঁর মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে করলেন ৩০০৲ টাকা। মাইনে বাড়ার সংগে তাঁর কাজও বাড়্‌ল। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে জায়গায় জায়গায় স্কুল করলেন তিনি। স্কুল তো হ'ল—শিক্ষক চাইতো! শিক্ষক তৈরি করবার জন্যে নর্মাল স্কুলও তাঁর চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল। এই সব কাজে প্রায় তিন বছর কেটে গেল। ছেলেদের আর শিক্ষকদের পড়বার স্কুলের কাজকর্ম দেখ্‌বার জন্যে পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) চাই। বিদ্যাসাগর নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান আর মেদিনীপুর এই চার জেলায় স্কুল প্রতিষ্ঠার ও পরিদর্শকের কাজও পেলেন। এইজন্যে তাঁর মাইনে হ'ল ২০০৲ টাকা। এখন বিদ্যাসাগর এই দুই পদের জন্যে মাইনে পেতে লাগ্‌লেন ৫০০৲ টাকা।

পূর্বে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী পড়ানো হ'ত না। বিদ্যাসাগরই সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী পড়ানোর নিয়ম করেন। এইরূপ নিয়ম হবার কিছুদিন পরে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। সেবারকার সংস্কৃত কলেজের কয়েকটি ছাত্র ঐ পরীক্ষায় পাশ হয়েছিল। এইরূপ পরীক্ষার ফল দেখে বিদ্যাসাগর কত যে খুসী হয়েছিলেন, তা আর তোমাদিগকে কি বল্‌বো।

এর পর আমাদের এই সিংহ-শিশুর আর এক বিক্রমের কথা বলি। শুনে তোমরা নিশ্চয় বল্‌বে—এত বিক্রম থাকে মানুষের মধ্যে—পাড়াগাঁয়ের 'পণ্ডিত-এর' মধ্যে! বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল। এই সময়ে কালীচরণ ঘোষ নামে এক যুবক ইংরাজী ভাষায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। বয়স কিন্তু তাঁর খুব কম। সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী পড়াবার জন্যে বিদ্যাসাগর তাঁকে মাসে ৪০৲ টাকা মাইনে দিয়ে মাষ্টারী দিয়েছেন। ক্লাসে যে-সব ছেলে পড়্‌তো তাদের অনেকের চেয়ে তাঁর বয়স কম। এই কারণে ছেলেরা মন দিয়ে তাঁর কাছে পড়্‌তো না—ক্লাসে গোলমাল করতো। আবার কেউ কেউ তাঁকে কলেজ হ'তে তাড়াবার চেষ্টাও করছিল। বিদ্যাসাগরের কানে উঠ্‌লো এই কথা। তিনি একদিন ক্লাসে গিয়ে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন—তোরা কে কে কালীবাবুকে কলেজ হ'তে তাড়াবার চেষ্টা করছিস্ বল্? কেউ স্বীকার করলো না। বিদ্যাসাগর ভয়ানক রেগে গিয়ে ক্লাসের সব ছেলেকে ক্লাস হ'তে বের করে' দিলেন। ছেলের পাল নালিশ করবার জন্যে পৌঁছলো কলেজের কর্তার

কাছে। কলেজের কর্তা কি ব্যাপার ঘটেছে বিদ্যাসাগরের কাছে জান্‌তে চাইলেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—কলেজের ভিতরকার ছোট ছোট ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষেরই অধিকার থাকা উচিত। ছেলের পাল যদি এইরূপ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করবার সুযোগ পায়, তা হ'লে তাদিকে শাসন করা যাবে না। কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরের কথা ঠিক বলে' মনে করে' ছেলেদের নালিশের কাগজ-পত্র সব বিদ্যাসাগরকে দিয়ে বল্‌লেন, আপনিই এর বিচার করবেন। ছেলেরা মনে করেছিল—এই যে তা'রা নালিশ করেছে—এতে বিদ্যাসাগরের চাকরী যাবেই, আর তা হ'লে ধরতে হবে বিদ্যাসাগরকে দাঁড়ি-পাল্লা। তা'রা হৈ-হুল্লোড় করে' বেড়াচ্ছিল। এমন সময়ে খবর পেলো তা'রা, বিদ্যাসাগরই এর বিচার করবেন। শুনে তাদের মুখ শুকিয়ে গেল—ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লো—সেই ছোট্ট মানুষটির বিক্রম স্মরণ করে'। কর্তৃপক্ষের কথায় তা'রা বিদ্যাসাগরের কাছে এসে ক্ষমা চাইবে বলে' মনে করলো। কিন্তু আগে যাবে কে? সেই বীর-পুরুষের কাছে যেতে কারো সাহস হয় না। ছেলেদের অভিভাবকরা এই ব্যাপার জেনে ছেলেদের বল্‌লেন—তোমরা বিদ্যাসাগরের কাছে যেয়ে ক্ষমা চাও গে! তাঁরা অনেকে বিদ্যাসাগরের কাছে এজন্যে গেলেনও। বিদ্যাসাগর তাঁদিকে বল্‌লেন—আপনারা ছেলেদিগকে কালীচরণ বাবুর কাছে যেতে বলুন—তিনি ক্ষমা করলে তবে আমি তাদিকে ক্ষমা করতে পারি। ছেলেরা কালীচরণ বাবুর কাছে যেতে পারলো না—বিদ্যাসাগরের

কাছে কান্নাকাটি সুরু করলো—আর তাদের যে খুব দোষ হয়েছে তাও স্বীকার করলো। কিন্তু সেই যে তিনি বলেছেন—কালীচরণ বাবুর কাছে যেয়ে ক্ষমা চাইতে—সেটার অন্যথা স্বীকার করলেন না। শেষে ছেলেদের যেতেই হ'ল কালীচরণ বাবুর কাছে—আর সেই সব অপরাধের জন্য ক্ষমাও চাইতে হ'ল। কালীচরণ বাবু ছেলেদের সংগে এলেন—বিদ্যাসাগরের কাছে। দয়ার সাগর তখন হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন কি, জানো? তিনি বলেছিলেন—"ওরে মুখ্‌খুরা দাঁড়ি-পাল্লা কে ধরবে রে!" যারা ছিল "পালের গোদা", তা'রা সাগরের সাম্‌নে মাথা হেঁট করে' দাঁড়িয়ে রইলো—কারো কারো চোখ হ'তে জলও পড়্‌তে লাগ্‌লো। চোখের জল দেখে সাগরের প্রাণ গেল গলে'। কালীচরণ বাবুকে সাম্‌নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কালীবাবু! ছেলেরা তোমার নিকট ক্ষমা চেয়েছে তো? কালীচরণ বাবু নীরব সম্মতি জানালেন, আর বল্‌লেন—এখন আপনার যা ইচ্ছে হয় করুন। বিদ্যাসাগর কি বলেছিলেন জানো? "কালীবাবু, তুমি যদি এদের ক্ষমা কর, তবেই আমি এদের ক্ষমা করতে পারি—নচেৎ নয়।" ছেলের পাল বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চেয়ে হেঁট মাথায় কাঁদতে লাগ্‌লো। চোখের জলের বন্যা এসে পড়্‌লো—সাগরে। বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—"যা, আর এমন কাজ করিস্‌ নি কখনো—কাল্‌ হ'তে কলেজে যাস্‌।" দেখ্‌লে কত বিক্রম আমাদের সিংহ-শিশুর।

এর পর বিদ্যাসাগরের আর একটি মহত্ত্বের কথা বলি—। একবার বিদ্যাসাগর এক বিশ্বাসী লোকের কথায় পণ্ডিত

তারা কুমার কবিরত্নের উপর একটু অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন। কবিরত্ন, বিদ্যাসাগরকে খুব ভালো ভাবেই জান্‌তেন। তিনি ভেবেছিলেন—যখন সে-বিষয়ে আমার কোনো দোষ নাই জান্‌বেন, তখন বিদ্যাসাগর আমার কাছে তা স্বীকার করতে আস্‌বেন। হ'লও তাই। কিছুদিন পরে জান্‌লেন, যে-কারণে তিনি কবিরত্নের উপর অন্যায় ব্যবহার করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তখন তাঁর হৃদয়ে উঠ্‌লো ভীষণ অনুতাপ। তিনি কবিরত্নের কাছে পৌঁছে—ক্ষমা চেয়ে বল্‌লেন—"তোমার উপর আমি যে অন্যায় করেছি, কি করলে আমার সে অপরাধ কাটে বলো?" কবিরত্ন বল্‌লেন—"সাগর, আমি তো জানি সাগরের বাষ্প হ'তেই মেঘ ওঠে; তা'রই বর্ষণে পৃথিবী শীতল হয়। তোমার হৃদয়ের সেই বেদনার বাষ্পেই আমি শীতল হ'য়ে পড়েছি। এজন্যে দুঃখ কোরো না—ভুল তো মানুষের হয়েই থাকে—আর ভুল স্বীকার করাতেই জেগে ওঠে সেই ভুল-করা মানুষের হৃদয়ের ছবি। এই জন্যেই তুমি বিদ্যাসাগর—দয়ার সাগর—মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র। তোমার ভুল স্বীকার করায় আমি দেখ্‌তে পাচ্চি তোমার মহত্ত্ব... কবিরত্ন আর কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না।" সাক্ষী রইলো তাঁদের উভয়ের আনন্দের অশ্রুজল।

বিদ্যাসাগরের এই সময়ের একটা মজার কথা বলি :—আগে যে কথাটা বললাম, তার পরে কবিরত্নের সংগে বিদ্যাসাগরের ভালোবাসা আরো বেড়ে ওঠে। এক দিন বিদ্যাসাগর গেছেন কলেজেরই কাজে এক জায়গায়। কাজ সেরে যখন ফিরছেন

তখন দেখ্‌লেন প্রায় ১০টা বাজে। কলেজ বসে ঠিক ১০টায়। বাসায় গিয়ে স্নান-আহার সেরে কলেজে তো ১০টার সময় পৌঁছনো সম্ভব নয়! এই জন্যে তাঁর মাথায় এক ফন্দি জেগে উঠ্‌লো। বিদ্যাসাগর দেখ্‌লেন—কবিরত্নের ছাত্ররা যে বাসায় খাওয়া-দাওয়া করত, সেই বাসাটা। বাসাটা দেখেই তিনি কি করবেন ঠিক করে' নিয়ে হন্‌ হন্‌ করে' ঢুক্‌লেন সেই বাসায়। দেখ্‌লেন, কলেজে যাবার জন্যে ছেলেরা খেতে বস্‌বে এবার। বিদ্যাসাগর পৌঁছেই—একখানা ভিজে কাপড় টেনে নিয়ে পরলেন। নিজের পরণের কাপড়, আর গায়ের মোটা চাদর, চটি জুতো জোড়াটা যথাস্থানে রেখে রাঁধুনীর কাছে যেয়ে একটু তেল চেয়ে নিয়ে দু-চার ঘটি জল মাথায় ঢাল্‌লেন—পাত-কো হ'তে জল তুলে নিয়ে। তার পর তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড় ছেড়ে পরলেন নিজের পোষাক—অবশ্য চটি জুতো জোড়াটা ছাড়া। কাপড় খানা পরে'—চাদর খানা গায়ে জড়িয়ে এক খানা পাতা টেনে নিয়ে করলেন কি জানো? বামুন ঠাকুর তখন সবেমাত্র ছেলেদের পাতায় ভাত পরিবেষণ করেছে; বিদ্যাসাগর এ-পাতা হ'তে এক মুঠো, ও-পাতা হ'তে এক মুঠো—এই রকম করে' ৩।৪ মুঠো ভাত নিজের পাতায় রাখ্‌লেন। ছেলেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগরের এই কাণ্ড দেখ্‌ছে—আর হাস্‌ছে; বামুন ঠাকুরেরও সেই অবস্থা। তার পর বামুন ঠাকুর ছেলেদের ও বিদ্যাসাগরের পাতায় দিল—ডাল্‌-তরকারী। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ধুয়ে ফেল্‌লেন হাত। পরলেন তিনি তাঁর চটি জুতো। ছেলেরা

খাওয়া শেষ করে' হাত ধুয়ে কলেজে গিয়ে দেখ্‌লো—বিদ্যাসাগর তাদের আগেই কলেজে পৌঁছে বসে' আছেন তাঁর নিজের জায়গায়! দেখ্‌লে বিদ্যাসাগরের কাণ্ডটা!

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বন্ধু ময়েট সাহেব কিছুদিনের ছুটি নিয়ে গেলেন ইংলণ্ডে। বাংলার ছোট লাট হ'য়ে এলেন—ফ্রেডারিক জে-হ্যালিডে। বিদ্যাসাগরের সংগে তাঁর পরিচয় ছিল—আগের থেকেই। বাংলা দেশে বিদ্যাসাগরের মতো বাংলা শিক্ষার বিস্তারের দিকে তাঁর নজর ছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর সংগে মিলে নূতন উৎসাহে বাংলা শিক্ষার বিস্তারের জন্যে কতকগুলি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। ময়েট সাহেব চলে' গেলে তাঁর জায়গায় এলেন ডব্লিউ গর্ডন ইয়ুং নামে এক ছোক্‌রা সিবিলিয়ান। এই ইয়ুং সাহেবের সংগে বনিবনাও না হওয়ায় বিদ্যাসাগর একদিন ছেড়ে দিয়েছিলেন—সেই ৫০০৲ টাকা মাইনের দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ। ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষা ছিল তাঁর; আসক্তির আকর্ষণ তাঁকে সে-কাজে ধরে' রাখ্‌তে পারলো না। তিনি ভেবেছিলেন, জীবন-ধারণ করতে হ'লে অন্ন চাই; কিন্তু সে-অন্নের জন্যে দাসত্ব করে' বেঁচে থাকায় পৌরুষের হানি হয়। পৌরুষেরই জয় হ'ল। সব ছেড়ে দিয়ে সব পাবার পথের সন্ধান পেলেন তিনি। জীবনের জয়-যাত্রার পথেই যে মরণ-আঘাত খেতে হয়। কিন্তু এই কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর, তুমি কাজটা ছেড়ে দিয়ে ভালো করলে না।" তার উত্তরে পুরুষ-সিংহ বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—"আমি টাকার চেয়ে—পদ-মর্যাদার

চেয়ে সম্মানটাকেই দামী বলে' মনে করি। যে-কাজে সম্মানের হানি হয়, সে-কাজ আমি চাই না।" কত জোরের কথা বল তো?

এতক্ষণ কতকগুলি কাজের কথা শুন্‌লে। এবার দু-একটা গল্প বলি শোন:—তোমরা শুনেছ, ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের সংগে বিদ্যাসাগরের গভীর শ্রদ্ধা আর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। বিদ্যাসাগর কি একটা কাজে গেছেন। দেখ্‌লেন, তাঁর আগেই ছোট লাটের সংগে দেখা করতে এসে অনেকেই বস্‌বার ঘরে বসে' আছেন। নিয়ম অনুসারে তাঁকে ছোট লাটের কাছে কার্ড (নাম-ঠিকানা-লেখা পত্র) পাঠাতে হ'ল। কার্ড পেয়েই ছোট লাট হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে তাঁর উপরের ঘরে আস্‌তে বল্‌লেন। আগের থেকে যাঁরা ছোট লাটের সংগে দেখা করতে এসে বসে' আছেন—তাঁদের মনে লাগ্‌লো আঘাত। কেউ কেউ-বা ছোট লাটের কাছে এই বিষয় নিয়ে অনুযোগও করেছিলেন। তা'তে হ্যালিডে সাহেব বলেছিলেন—"আপনারা আসেন নিজের কাজে, আর উনি আসেন আমার কাজে। কাজেই, যদি আমি তাঁকে আগেই ডেকে থাকি, তা'তে কোনো দোষ হয়েছে বলে' আমি মনে করি না।" দেখ্‌লে, ছোট লাটের সহিত বিদ্যাসাগরের কেমন প্রীতির সম্বন্ধ!

আর একটি গল্প বলি:—হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে নানাবিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে আমার এখানে আস্‌বেন। বিদ্যাসাগর যেতেন

তাঁর সেই পোষাকে—মোটা সূতোর ধুতির ওপর মোটা চাদর গায়ে—আর পায়ে তাঁর সেই তালতলার চটি। হ্যালিডে সাহেব অনেক অনুরোধ করায় কয়েক বার বিদ্যাসাগর গিয়েছিলেন, তাঁর বাড়ীতে পেন্টুলন, চোগা, চাপকান আর মাথায় পাগড়ী পরে'। কিন্তু এই পোষাকটা পরে' তিনি মনে করতেন—যেন সঙ্ সেজেছেন। এই পোষাক পরা তাঁর কষ্টকর হওয়ায় চার দিনের দিন হ্যালিডে সাহেবকে বলেছিলেন—"এই আপনার সংগে আমার শেষ দেখা।" সাহেব শুনে চম্‌কে উঠে বলেছিলেন—"কেন পণ্ডিত, কি হয়েছে যে আর দেখা হবে না।" সাগরের মুখে খেলে গেল হাসির ঝিলিক! হৃদয়ে জেগে উঠ্‌লো প্রীতির তরংগ! সব কথা শুনে হ্যালিডে সাহেব বল্‌লেন—"ও-রকম পোষাক পরে' আসায় যদি আপনার কষ্ট হয় তবে যে-পোষাকে আসায় আপনার অসুবিধা হবে না, সেই পোষাক পরে'ই আস্‌বেন। এ-বিষয়ে আমার পছন্দ-অপছন্দ কিছু নেই।" এর পর তিনি লাট-ভবনে যেতেন তাঁর চিরকেলে পোষাকে—পরণে থান ধুতি—গায়ে তাঁর সেই মোটা চাদর—আর পায়ে সেই মুখবাঁকানো তালতলার চটি! এমনি ছিল তাঁর নিজের পোষাকের প্রতি দরদ।

আরো একটা গল্প বলি :—পরের দাসত্বে জীবনে শক্তির বিকাশ হয় না। এ-বিশ্বাস বিদ্যাসাগর মশাইয়ের খুব বেশী ছিল। তাই তিনি যে-চিঠি লিখে চাকরী ছেড়ে দিয়েছিলেন, তা'তে লিখ্‌তে পেরেছিলেন—



গোলদীঘিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্তি—৬৮ পৃঃ

"আমি আর যতদিন বাঁচ্‌বো সেই সময়টা দেশের ছেলে-মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয় তার জন্যে চেষ্টা করবো, আর আমার সেই ব্রত আমার মৃত্যুর পরে আমার শ্মশানের ছাইয়ে মিশে সার্থক হবে।"

তাঁর লেখা ভাষা হয়তো তোমরা বুঝ্‌তে পারবে না—তাই সোজা কথায় তোমাদের বল্‌লাম। এই সময়ের আর একটি বেশ চমৎকার কথা বলি। তাঁরি মতো দেশের কাজে—গরীব-দুঃখীর দুঃখ দূর করতে—মনঃ-প্রাণ ঢেলে দিয়ে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বসেছিলেন—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই। তাই তাঁর আপনার লোক যাঁরা, তাঁরা বিদ্যাসাগরের কাছে আপনাদের দুঃখ জানাচ্ছিলেন। তাই শুনে তিনি কি বলেছিলেন, জানো? তিনি বলেছিলেন—"সে পাগ্‌লার চাকরী ছাড়ার দুঃখ-কাহিনী বল্‌বার বুঝি আর জায়গা পেলে না? এক পাগ্‌লার পাগ্‌লামীর কথা আর এক পাগ্‌লার কাছে বল্‌তে এসেছ!" এই বলে' জোর গলায় আবার বলেছিলেন—"কাজ ছেড়ে বেশ করেছে—পরের পা চেটে চেটে এ-জাতটা উচ্ছন্ন গেছে! লোক তাঁবেদারী করা যত ছাড়্‌বে ততই বাঁচবে।" দেখো তো কেমন জোরালো কথা!

চাকরী ছেড়ে দিয়ে খর্‌চে-মানুষ বিদ্যাসাগরের একটু অসুবিধা হচ্ছিল—নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি সে অসুবিধেকে অসুবিধে বলে' মনের কোণে জায়গা দেন-নি। এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের বন্ধুগণ—দেশীয় ও ইংরাজ বন্ধুরা পর্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। সেই

সময়ের এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ-কর্মচারী কল্‌ভিন সাহেব বলেছিলেন —"বিদ্যাসাগর, তুমি আইনের পরীক্ষা দিয়ে ওকালতি করো— বেশ দু-পয়সা উপায় করতে পারবে—তুমি যে-কাজ আরম্ভ করেছ তার অনেক সুবিধে হবে।" তিনি তা ইচ্ছেও করেছিলেন। কিন্তু ওকালতির কাজে অনেক সময়ে মিথ্যের বেসাতি করতে হয় বলে' ওকালতি করবার ইচ্ছে তাঁর উবে যায়।

গল্প তো তিনটে বল্‌লাম। এর পর হবে অন্য কথা।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনা

চাকরী ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর সময় পেয়েছেন প্রচুর। দেশের বড় বড় জমিদার, রাজা-রাজড়া, ধনবান্, পণ্ডিত—সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন—সকলের সংগেই তাঁর জানাশোনা। দেশের কথা আলাদা; বিদেশের পণ্ডিতদের কাছেও তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা পৌঁছেছে। আমাদের দেশে যে-সব সাহেব-সুবা আছেন, তাঁদের সংগে তো পরিচয় আছেই; তা-ছাড়া দেশের ছোটলাটের সংগেও তাঁর পরিচয়। এ-সব তো আছে, তা-ছাড়া বিদেশ হ'তে কোনো গণ্য-মান্য লোক আমাদের দেশে এলেই তাঁরা বিদ্যাসাগরের সংগে পরিচয় করে' ধন্য হ'তেন। নিজের সুখ-সম্পদ তিনি চাইতেন না—বিষয়-সম্পত্তির দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু তাঁর তখন এমন সুযোগ-সুবিধে ঘটেছে, ইচ্ছে করলেই তিনি অনেক-কিছু করে' নিতে পারতেন। কর্মযোগী তা করেন নি—করেছিলেন নিজেকে ছাড়িয়ে অন্যের চিন্তা—অপরের মংগল। কাজ ছেড়ে দিয়ে ভাবছেন, কি করবেন তিনি। একে একে ভেসে উঠ্‌লো তাঁর চোখের সাম্‌নে—দেশের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার দিকে—ছেলে-মেয়েদের পড়বার মতো ভালো ভালো বইয়ের দিকে—দেশের ও দশের সেবার দিকে—সমাজের কুনীতি ও কুসংস্কারের দিকে—আর তা দূর করবার উপায় তিনি করতে পারেন কি না, সেই আত্মশক্তির দিকে। এই অধ্যায়ে তোমাদিগকে একে একে এই সব কথাই বল্‌বো।

ছেলেদের পড়বার জন্যে চাকরী-জীবনে কয়েকটি স্কুল তিনি করেছিলেন—পূর্ব অধ্যায়ে তোমরা পড়েছ। এইজন্যে তিনি হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, এই চার জেলায় ঘুরে ঘুরে জায়গায় জায়গায় কতকগুলি স্কুল খুলেছিলেন—ছেলেদের পড়বার জন্যে। কয়েকটি স্কুলও তিনি খুলেছিলেন মেয়েদের জন্যে। কিন্তু ঐ মেয়েদের স্কুল নিয়ে কর্তৃপক্ষের সংগে তাঁর মতান্তর ও মনান্তর ঘট্‌লো; এইজন্যে তাঁর মত স্বাধীনচেতা পুরুষকে চাকরী ছাড়তে হয়েছিল। চাকরী ছেড়েই ঐ-সব স্কুলে পড়াবার মতো বইয়ের অভাব তাঁর চোখে পড়্‌লো। তাই তিনি লেগে গেলেন, তারি কাজে। প্রথমেই বুঝলেন তিনি-ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সুরু করবার সময়ে ভালো বইয়ের অভাব। একদিন তিনি একটা স্কুল দেখ্‌তে গেছেন। পাল্‌কিতে চড়ে' আস্‌ছেন তিনি। হঠাৎ এই চিন্তাই জাগ্‌লো তাঁর হৃদয়ে। তিনি তখ্‌খনি তাঁর ব্যাগ্‌ হ'তে কাগজ-পেন্‌সিল বের করে' লিখতে বস্‌লেন—অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। স্বরবর্ণ বারোটা—আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ টা দু-তিন পাতায় লিখ্‌লেন। তারপর অক্ষর চেনা ঠিক হয়েছে কি না, জান্‌বার জন্যে অক্ষরগুলো উল্টো পাল্টা করে' আরো কয়েকপাতা লেখার পর বানান লিখ্‌তে আরম্ভ করলেন—কর, খল, ঘট, জল,—অচল, অধম ইত্যাদি। এই রকম করে' আকার, ইকার, ঈকার, উকার, ঊকার, ঋকার, একার, ঐকার, ওকার, ঔকার, অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু—সোজা সোজা কথা দিয়ে বানান সাজালেন। এ-বিষয়ে আরো অনেক কথা আছে; ও-সব এখন থাক্‌। শেষের

দিকে পড়া শেখার জন্যে ছোট ছোট বাক্য—যেমন বড় গাছ, ভাল জল, লাল ফুল, ছোট পাতা ইত্যাদি। তারপর বইয়ের শেষে গোপাল ও রাখাল এই দুইটি ভালো ও মন্দ ছেলের কথা লিখে বই শেষ করলেন। ছাপার পর বইখানি ৫০ পাতায় শেষ হয়েছিল। বইখানির নাম রাখ্‌লেন তিনি বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ। পাল্‌কির ভিতরে বসে' ৫০ পাতার বই লেখা সহজ কথা কি! কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল—তাঁতে। এর পর তিনি লেখেন বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ। কিন্তু তা পাল্‌কির ভিতর বসে' নয়।

এই বর্ণ পরিচয় লেখার একটা ইতিহাস আছে। বিদ্যাসাগরের এক বিশিষ্ট বন্ধুর নাম প্যারিচরণ সরকার। ছেলেমেয়েদের পড়বার জন্যে দুই বন্ধুতে বাংলা ও ইংরাজী বই লিখ্‌বেন—একদিন কথা হ'ল। বিদ্যাসাগর লিখ্‌বেন বাংলা বই—আর প্যারিচরণ লিখ্‌বেন ইংরাজী বই। বিদ্যাসাগর একদিনে বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ লিখে ফেলেছেন জেনে প্যারিচরণ ইংরাজী ফার্ষ্ট বুক লিখ্‌লেন। এই রকম করে' দুই বন্ধুতে ছেলেমেয়েদের জন্যে বাংলা ও ইংরাজী কয়েক খানি বই লিখে ফেলেছিলেন।

আগে তোমরা পড়েছ, রাজকৃষ্ণ বাবুকে সহজে সংস্কৃত শেখাবার জন্যে এক রাত্রির মধ্যে তিনি বাংলা অক্ষরে একখানা বই লিখেছিলেন। তার নাম উপক্রমণিকা। সেই বইখানা ভালো' করে পড়্‌লে মোটামুটি সংস্কৃত শেখা যায়। এখনো ঐ বইয়ের আদর আছে। এর পরে লেখেন—ব্যাকরণ কৌমুদী চার ভাগ।

এতেও সংস্কৃত শেখা সহজ হয়েছে। মুগ্ধ (মূঢ়) ব্যক্তির বোধ-এর জন্যে এখন আর 'মুগ্ধবোধ'-এর বেড়াজাল ছেলেদিগকে ডিঙ্গুতে হয় না—বিদ্যাসাগরের আশীর্বাদে।

"বাসুদেব চরিত" বিদ্যাসাগরের প্রথম লেখা বাংলা বই। এই বইখানি ছাপা হয় নি—হাতের লেখাই আছে। তার পর ছাপা হ'ল "বেতাল পঞ্চ - বিংশতি"—হিন্দী বইয়ের বাংলা অনুবাদ। ২৫টি গল্পের বই। বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু মার্শেল সাহেব ঐ বেতাল পঞ্চ-বিংশতি ১০০ খানা ৩০০৲ টাকায় কিনে-ছিলেন। এই ৩০০৲ টাকায় তাঁর বই ছাপার খরচ উঠেছিল। এর পর লেখেন "বাংলার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ।" এই বইখানি তখনকার স্কুলে পড়ানো হ'ত। তার পর লেখেন "জীবন-চরিত"—ইউরোপের গ্রীস, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বীরগণের বীরত্বের কথা। তার পর লেখেন—"আখ্যানমঞ্জরী", "চরিতাবলী"—বিদেশের মহাত্মাদের চরিত-কথা। তার পর ক্রমে ক্রমে "বোধোদয়, শকুন্তলা, বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব পুস্তক"। এই বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব বের হওয়ামাত্র আমাদের দেশে হৈ-চৈ পড়ে' গেল। সেই সময়ে তিনি শান্তভাবে নিজের ঘরে বসে' লিখ্‌ছিলেন —ছেলেদের জন্য "কথামালা চরিতাবলীর অন্যান্য খণ্ড" প্রভৃতি বই। তেজস্বী বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এ-ও একটা দেখ্‌বার বিষয়। তার পর লেখেন "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।" তার পর "মহাভারতের উপক্রমণিকা"। এই অংশ ছাপা হয়েছিল—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়—ক্রমে ক্রমে। পরে বইয়ের

আকারে বেরিয়েছিল। তার পর লেখেন তিনি "সীতার বনবাস।" এই বই অনেক দিন স্কুলে পড়ানো হ'ত—এখনও হয়। তার পরে লেখেন—"রামের রাজ্যাভিষেক।" কতকটা ছাপাও হয়েছিল। এমন সময়ে শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখা "রামের রাজ্যাভিষেক" বিদ্যাসাগরের হাতে দিলেন। পড়ে' দেখ্লেন তিনি; বইখানি মন্দ হয় নি, দেখেই তিনি তাঁর ঐ বইয়ের বাকিটা আর ছাপেন নি। দেখ তো বিদ্যাসাগরের উদারতা কত! এর পর লেখেন, "সটীক মেঘদূত" আর "ভ্রান্তিবিলাস"—বর্ধমানে—রোগশয্যায় শুয়ে। এই "ভ্রান্তিবিলাস" নির্মল হাসির ঝরণা। এই বইখানি বাঙালী পাঠকের খুব আদরের জিনিষ হয়েছিল। এর পর—"বহু-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব" লেখা হ'ল—বাংলার কুলীনদের ১০টা—২৫টা, এমন কি ১০০টা পর্যন্ত বিবাহ দেখে—আর কুলীন-কন্যাদের স্বামী থাক্তেও বৈধব্য দেখে। এই দুখানি বইয়ের আলোচনা কর্বো—অন্য অধ্যায়ে।

বিদ্যাসাগর মোট ৫২ খানি বই লিখেছিলেন—বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী মিলিয়ে। শুধু বই লেখা নয়—বাঙালী পাঠকের হাতে দিয়েছিলেন একখানা খবরের কাগজ—সোমপ্রকাশ। এই সকল বইয়ের লেখা পড়ে' সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গলা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।"

বিদ্যাসাগরের এই "সাহিত্য-সাধনা" বিষয়ে আর একটা কথা এখনো বলা হয় নি ; কিন্তু তা আগে বলাই উচিত ছিল। বই লিখ্‌লেন তিনি অনেক। কিন্তু সেগুলি ছাপা চাই তো। ছাপা না হ'লে লোকের চোখে পড়বে কেন ? পরের ছাপাখানায় বই ছাপ্‌তে গেলে খরচও বেশী পড়ে, আর অসুবিধেও অনেক। চাপ্‌লো তাঁর মাথায় ছাপার প্রেস। তিনি আর তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকার দুজনে মিলে ২০০৲ টাকায় একটা হ্যাণ্ড প্রেস (হাতে-চালানো ছাপার কল) কিন্‌লেন। দুই বন্ধুই লেগে গেলেন ছাপার কাজে। অবশ্য তাঁরা দু'জনে টাইপ সাজাতেন না। টাইপ সাজিয়ে দেন যাঁরা, তাঁদের বলা হয়—কম্পোজিটার। কয়েকজন কম্পোজিটার এনে প্রেস চালানো হ'ল। প্রেসের নাম দেওয়া হ'ল সংস্কৃত প্রেস। বই লিখ্‌তেন তিনি। কম্পোজিটারেরা কম্পোজ করে' প্রুফ তুলে দিলে তিনি প্রুফ দেখ্‌তেন—আর যেখানে লেখার দোষ থাক্‌তো বা টাইপ সাজাবার ভুল থাক্‌তো তা ঠিক করে' দিতেন। এই রূপে কয়েকখানা বইও ছাপা হ'ল। অন্য বইয়ের দোকানে বিক্রীর জন্যে বই রাখ্‌লে তাদের কিছু কিছু কমিশন দিতে হয় বুঝে তিনি একখানি বইয়ের দোকানও খুলেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন তিনি "সংস্কৃত বুক্ ডিপজিটারী।" তাঁরই প্রেসে ছাপা আর তাঁরই বইয়ের দোকানে বই বিক্রী হওয়ায় তাঁর অনেক লাভ হ'তে লাগ্‌লো। 'সংস্কৃত প্রেস' এখন আর নাই—উঠে গেছে। কিন্তু সংস্কৃত বুক্ ডিপজিটারী নামে

এক বইয়ের দোকান কর্ণওআলিস্ ষ্ট্রীটে এখনো তাঁর নাম জাগিয়ে রেখেছে।

এখানে একটা কথা বলি। তোমরা তোমাদের পড়বার বইয়ে মাঝে মাঝে ছেদ-চিহ্ন দেখ্‌তে পাও। ছেদ-চিহ্ন কা'কে বলে' জানো? পড়বার সময়ে একটানা পড়া তো যায় না—মাঝে মাঝে থাম্‌তে হয়—গলার আওয়াজও অন্য রকম কর্‌তে হয়। এজন্যে ব্যবহার হয় কমা (,)—এক সেকেণ্ড আন্দাজ সময় থাম্‌তে। আরো একটু বেশী থাম্‌বার দরকার হ'লে ব্যবহার হয় সেমিকোলন (;)। জিজ্ঞাসার সুর গলায় বের কর্‌বার জন্যে জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?); আশ্চর্য, বিস্ময় বা সম্বোধন বোঝাতে ব্যবহার হয় এই চিহ্ন (!)। এই রকমে কমা, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদ, জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, কোলন ড্যাস, ড্যাস প্রভৃতি চিহ্ন আছে। পূর্বে বাংলা লেখায় এইরূপ ছেদ-চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর বইয়ে ঐ-সব চিহ্নের প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন—"**বিদ্যাসাগর একাকার সমভূম বাংলা রচনার মধ্যে এই ছেদ-চিহ্নের ব্যবহার করিয়া বাংলা ভাষায় নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে যাহা জড় ছিল, তাহা সচল হইয়াছে।**"

অবলা-বান্ধব বিদ্যাসাগর

(১)

তোমরা পড়েছ হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর এই চার জেলায় স্কুল ইনস্পেক্টর থাকা কালে মার্শেল সাহেবের কথা মতো বিদ্যাসাগর কয়েকটি মেয়েদের স্কুল খুলেছিলেন। সেখানে মেয়েদের স্কুলের মাইনে তো লাগ্‌তো না ; তার উপর দিতে হ'ত মেয়েদিগকে বই, শ্লেট, কাগজ, কলম ইত্যাদি। এতে প্রতি মাসে অনেক টাকা খরচ হ'ত। বিদ্যাসাগরই এই খরচ চালাতেন। কিন্তু এতগুলি স্কুলের খরচ চালানো কি সোজা কথা ! বিদ্যাসাগর শিক্ষা-বিভাগের কাছে টাকা চাইলেন। তখন শিক্ষা-বিভাগের কর্তা ইয়ং সাহেব। নূতন নিয়ম অনুসারে ইয়ং সাহেব সে-টাকা দিলেন না। বিদ্যাসাগর জানালেন মার্শেল সাহেবকে। কিছুদিন চুপ্‌চাপ্‌ থেকে মার্শেল সাহেব বিদ্যা-সাগরকে বলেছিলেন—"টাকা যখন মঞ্জুর হ'ল না—আর আমারি কথা মতো যখন আপনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, তখন সেই টাকার জন্যে আপনি আমার নামে আদালতে নালিশ করুন।" তার জবাবে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—"আদালতে আমি কখনও যাই নাই—এ ক্ষেত্রেও যেতে পারি না ; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—যেমন করেই হোক, আমি এ-দেনা পরিশোধ করে' দেবো।" হয়েছিলও তাই। এই অপ্রীতিকর ঘটনাই বিদ্যা-

সাগরের ৫০০৲ টাকা মাইনের চাকরী ছাড়ার প্রধান কারণ। যাই হোক, কোনোরূপে বালিকা বিদ্যালয়ের সব দেনা চুকিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। তাঁর প্রাণে জেগেছিল সেই মহামন্ত্র—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

তিনি দেশবাসীর প্রাণে এই মন্ত্র জাগাতে চাইলেন। হ'লই বা কষ্ট—হ'লই বা অসুবিধে। এর আগে ঐ মন্ত্রেই স্বর্গত রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রাণে জেগেছিল—মেয়েদের শিক্ষার দিকে অনুরাগ। সেই সময়কার মহিলা-শিক্ষা-সমিতি মেয়েদের যে-সব স্কুল স্থাপন করেছিল, কয়েক বছর তার কাজ বেশ চল্‌লেও শেষে পয়সার অভাবে তা বন্ধ হ'য়ে যায়। এলেন এমনি সময়ে অবলা-বান্ধব বেথুন সাহেব—বড়লাটের বড় দরবারের বড় মাইনের চাকরী (ব্যবস্থা-সচিবের পদ) পেয়ে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। নারী-কল্যাণের স্বর্গীয় সৌরভে মশ্‌গুল ছিল তাঁর প্রাণ; মলয় বাতাস রূপে সেই প্রাণে কাঁপন তুল্‌লো বিদ্যাসাগরের নারী-কল্যাণের প্রবৃত্তি। দু'জনে মণিকাঞ্চন যোগ হ'ল। একে অন্যের ওপর ভরসা রেখে অগ্রসর হ'লেন—কার্যক্ষেত্রে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই দু-জনের মধ্যে সদ্ভাব খুবই বেড়ে উঠ্‌লো—আর সেই সদ্ভাবের ফলে ঘটে' উঠেছিল স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাসাগর মহাত্মা বেথুনের সহিত মিলিত হ'য়ে শত বাধা উপেক্ষা করে' সেই বিদ্যালয়ের যাতে উন্নতি হয়, সে-বিষয়ে চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন। এই জন্যে তিনি দেশবাসীর

কাছে কম নিন্দিত হন নি। শুধু তিনি কেন, বিদ্যাসাগরের মতো আরো অনেককে নানা কথা শুন্‌তে হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে বেশী কথা শুন্‌তে হয়েছিল—পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালংকারকে। অপরাধ তাঁর, তিনিই তাঁর ভুবনমালা ও কুন্দমালা নাম্নী কন্যা দুটিকে সকলের আগেই পাঠিয়েছিলেন—বেথুন সাহেবের স্কুলে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে' বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরকে করেছিলেন তার সেক্রেটারী। বেথুন, স্কুলে যাবার সময়ে মেয়েদের জন্যে নানারকম খেলনা নিয়ে আস্‌তেন আর মেয়েদের নিয়ে নানারূপ খেলাও করতেন। সময়ে সময়ে নিজে ঘোড়া হ'য়ে, হামা দিয়ে, স্কুলের মেয়েদিগকে পিঠে চড়াতেন—আর মেয়েরা সওয়ার হ'য়ে হেট্‌ হেট্‌ করে' সেই ঘোড়া চালাতো। এমনি ছিল মেয়েদের উপর ভালোবাসা তাঁর। একদিন তিনি জনাই গ্রামের স্কুল দেখ্‌তে গেলেন—সেখানকার বহু লোকের উপরোধে। যাবার সময় খুব বৃষ্টির মধ্যে পড়েন তিনি। সর্বাংগ ভিজে গেছে তাঁর। পথে কাদাও হয়েছে। গাড়ী চলে না—অগত্যা সেই ভিজা কাপড়ে হেঁটে তাঁকে যেতে হয়েছিল অনেকটা রাস্তা। ফিরে এলেন কল্‌কাতায়। এসেই পড়্‌লেন জ্বরে। দীর্ঘ দিন এই জ্বরে ভুগে তিনি মারা গেলেন। এখন বেথুনের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের ভার পড়লো বিদ্যাসাগরের ওপর। এজন্যে তাঁকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছিল। স্কুলের বাড়ী তৈরী করবার জন্যে বেথুন অনেক টাকা রেখে

গিয়েছিলেন। সেই টাকায় স্কুলের বাড়ী হ'ল। স্কুলের নামও হ'ল—বেথুন বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় যাতে ঠিক-মতো চলে, তার জন্যে বিদ্যাসাগরকে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল। সেই সময়ে গভর্ণর জেনারেল ছিলেন—লর্ড ক্যানিং। তাঁর স্ত্রী লেডি ক্যানিং বিদ্যাসাগরকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। তাই ঐ স্কুল পরিচালনায় তিনি অনেক সাহায্যও করেছিলেন। এঁদেরই চেষ্টায় ঐ স্কুল বেথুন কলেজ নামে পরিচিত হ'য়ে মহাত্মা বেথুন ও বিদ্যাসাগর মশাইয়ের নাম চিরস্মরণীয় করে' রেখেছে।

এই সময়ে মিস্ কার্পেণ্টার নাম্নী এক ইংরাজ-মহিলা এদেশে এসেছিলেন। অপরের মংগল করাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তাঁর সাথে বিদ্যাসাগরের পরিচয় হ'ল। শুধু পরিচয় নয়—পরিচয়ের পর সুরু হ'ল—আত্মীয়তা। উভয়ের উদ্দেশ্য এক। কাজেই, তাঁরা পরস্পরের কাজেও সহায় হ'য়ে উঠ্‌লেন। এই জন্যে বিদ্যাসাগর অনেক সময়ে কুমারী কার্পেণ্টারের সহিত দু-এক জায়গায় যাওয়া-আসা করতেন। কুমারী কার্পেণ্টার যাবেন উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় দেখ্‌তে। সংগে নিয়েছিলেন তিনি বিদ্যাসাগরকে। বিদ্যাসাগর একটা বগি গাড়ীতে চড়ে' বালি স্টেশন হ'তে উত্তরপাড়ার পথে যাচ্ছিলেন। উত্তরপাড়ার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন। এমন সময়ে গাড়ীর ঘোড়াটা একটা মোড় ফেরবার পথে একটু বিগ্‌ড়ে যাওয়ায় গাড়ীখানা উল্টে যায়। বিদ্যাসাগর গাড়ী হ'তে ছিট্‌কে পড়লেন অনেকটা তফাতে—একটা

খানার ধারে। পড়ে'ই তিনি অচেতন। একটু পরেই সেখানে পৌঁছ'লো—কুমারী কার্পেণ্টারের গাড়ী। বিদ্যাসাগরকে সেই অবস্থায় পড়ে' থাক্‌তে দেখে কুমারী কার্পেণ্টার গাড়ী হ'তে নেমে সেই খানা হ'তে তুল্‌লেন ; আর কোলে তুলে নিয়ে নিজের রুমাল বের করে' বাতাস করতে লাগ্‌লেন। বিদ্যাসাগর এই ঘটনার কথা তাঁর এক প্রিয়পাত্রকে বল্‌বার সময় বলেছিলেন কি, জানো ? তিনি বলেছিলেন—' আমায় যখন চেতনা হ'ল আমার মনে হ'ল যেন আমি মায়ের কোলে শুয়ে আছি।" এই গাড়ী হ'তে পড়ে' যাওয়ায় তাঁর যকৃতে খুব আঘাত লেগেছিল। এই আঘাতের ফলে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে—স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। মধ্যাহ্ন-সূর্য অসময়ে ঢলে' পড়্‌লো অস্তাচলের পথে।

এই কুমারী কার্পেণ্টার বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন বলে' তোমাদিগকে তাঁর কথা শোনালাম। এই জায়গায় আর একটা কথা বলি।

বেথুন কলেজের কথা বলেছি। সেই কলেজে এখন অনেক মেয়ে পড়্‌ছেন। তাঁদের অনেকেই ছেলেদের মতো বি, এ ; এম্‌, এ-ও পাস্‌ কর্‌ছেন। সেই সময়ে বেথুন কলেজ হ'তে পাস্‌ কর্‌লেন শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু। শুধু পাশ করা নয়—ভালো করে'ই পাস্‌ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর খুব খুসী হ'য়ে তাঁকে এক-প্রস্থ সেক্‌স্‌পিয়ারের গ্রন্থাবলী উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এরপর আমরা তোমাদের শোনাবো—বিদ্যাসাগরের স্ত্রীজাতির প্রতি আর এক দরদের কথা।

(২)

বিদ্যাসাগর এক সময়ে বলেছিলেন—আমি শুনেছি, আমাদের দেশের অনেকেই আমাকে বলেন—আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী। কথাটা যে খুব মিথ্যে, তা নয়। আমি বাবার মুখে শুনেছি—কল্‌কাতায় এসে তিনি একদিন ক্ষিদেয় কাতর হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্ছেন। এসে পৌঁছলেন—এক মুড়ি-মুড়্‌কীওয়ালীর দোকানের সাম্‌নে। বাবা একটু খাবার জল চাইলেন তা'র কাছে। সে আদর করে' বাবাকে জল তো দিলই–আর তা'র সংগে দিল কিছু মুড়কী। গলায় পৈতে দেখে বামুনের ছেলে মনে করে' অমনি এক ঘটি জল দেয় কি করে'! দারুণ ক্ষিদে বাবার। মুড়কীগুলি তাড়াতাড়ি খাচ্চেন দেখে বলেছিল সে—বাবাঠাকুর, তোমার আজ খাওয়া হয় নি, বোধ হয়। বাবা বলেছিলেন, না, মা। তাই শুনে সেই মুড়ি-মুড়কীওয়ালী বলেছিল—বাবা, একটু সবুর কর। এই বলে'ই কাছের দোকান হ'তে দই কিনে এনে সেই দই দিয়ে চিঁড়ে-মুড়কী 'ফলার' কারয়েছিল; আবার এ-ও বলেছিল—বাবাঠাকুর, যেদিন তোমার খাওয়া হবে না—আমার দোকানে এসে 'ফলার' করে' যেয়ো। রাস্তায় অনেক পুরুষ মানুষের দোকান রয়েছে—কিন্তু বাবার সেই শুক্‌নো মুখ তো কোনো পুরুষের চোখে পড়ে নি; পড়েছিল—সেই বিধবা মুড়ি-মুড়কীওয়ালীর—স্ত্রীজাতির।

আমরা থাক্‌তাম তখন বড়বাজারে জগদ্দুর্লভ বাবুর বাড়ীতে। নীচের তলায় রান্নাঘর—এঁদো স্যাঁৎসেঁতে। রাঁধুনী আমি;

দশ-বারো বছর বয়স তখন আমার। সংস্কৃত কলেজে পড়ি তখন। রান্না করবার সময় উপর থেকে নেমে আস্‌তেন জগদ্দুর্লভ বাবুর বোন—রাইমণি। আমার তরকারী কুটে দিতেন—বাট্‌না বেটে দিতেন; আবার কূয়ো হ'তে জলও তুলে দিতেন। রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে পড়াশুনা ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লে—বাবা আফিস থেকে এসে আমাকে সেই অবস্থায় দেখে দিতেন বেদম্ প্রহার! প্রহারের চোটে কেঁদে উঠ্‌তাম আমি। রাইমণিই ওপর থেকে নেমে এসে বাবাকে কত কথা শোনাতেন; এমন কি, রাগের চোটে বাবাকে তাঁদের বাড়ী হ'তে উঠে যেতে বল্‌তেন। বাড়ীতে ছিলেন অনেক পুরুষ, কিন্তু তাঁদের তো আমার ওপর তত দরদ দেখিনি। তাঁদের তো কেউ আমার রান্নাঘরে এসে আমার কাজে সাহায্যও করেন নি—আমার প্রহারে বাবাকে তো কেউ কোনো কথা বলেন নি! বলেছিলেন—মায়ের প্রাণ ঐ রাইমণি! কাজেই, আমি যদি স্ত্রীজাতির প্রতি পক্ষপাতী হ'য়েই থাকি, বোধ হয় অন্যায় করি নি। এই স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল বলে' তাঁদের জন্যে তাঁর প্রাণ কাঁদ্‌তো।

বিদ্যাসাগর কল্‌কাতা হ'তে তাঁর বীরসিংহের বাড়ীতে এসেছেন। মায়ের কাছে বসে' মায়ে-পোয়ে কত কথা হচ্চে। হঠাৎ কানে এলো তাঁর, কান্নার আওয়াজ। কিসের কান্নার শব্দ! মা খবর নিয়ে শুক্‌নো মুখে এসে বল্‌লেন—ওরে ঈশ্বর,.........অমুকের মেয়ে—আহা, ন-বছরের মেয়ে—বিধবা হয়েছে পরশু, তার খবর এসেছে এক্ষুনি। তাই সকলে আকুলি-বিকুলি করে'

কাঁদ্‌ছে। মা তখন বলেছিলেন—ওরে ঈশ্বর, তুই তো এতো শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়েছিস্—শাস্ত্রের কোথাও কি নেই এই রকম বিধবাদের আবার বিয়ে দেবার বিধান! * ঈশ্বরের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল—সেই ন-বছরের মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে। শাস্ত্রের বিধান তো তাঁর জানা ছিল না। কল্‌কাতায় ফিরে এসে মায়ের সেই কথাটা তাঁর মনে জেগে উঠ্‌লো। তিনি শাস্ত্রের বিধান খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। পড়্‌লেন অনেক বই। মিল্‌লো না সন্ধান। পড়্‌ছেন পরাশর সংহিতা। হঠাৎ চোখে পড়্‌লো তাঁর—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

এই শ্লোকটি। শ্লোকটির অর্থ ভালো করে' বুঝ্‌লেন তিনি। হৃদয়ে জেগে উঠ্‌লো আনন্দ! এই মন্ত্রই তো তিনি খুঁজিছলেন! এই শ্লোকটির বাংলা কবিতায় অনুবাদ করে' শোনাই তোমাদের—

স্বামী যদি নিরুদ্দিষ্ট, কিংবা রোগে মরে,
যতি, নপুংসক, কিংবা ধর্ম্ম ত্যাগ করে;
এ পাঁচ আপদে নারী রাখিতে সম্মান
বিবাহ করিবে পুনঃ—শাস্ত্রের বিধান।

তখনি তিনি সেই পড়্‌বার ঘর হ'তে 'পেয়েছি পেয়েছি' বলে'

---

* কেউ কেউ বলেন, বিধবা-বিবাহে শাস্ত্রের বিধান কি, জান্‌বার জন্যে তিনি মায়ের আদেশ পান্ নি। সেই ন-বছরের বালিকার অন্ধকার ভবিষ্যৎ ভেবেই তিনি বিধবার বিবাহে শাস্ত্রের বিধান কি, খোঁজ্‌বার চেষ্টা করেছিলেন।

চীৎকার করে' বেরিয়ে এলেন। মুখে-চোখে খেল্‌ছে তাঁর আনন্দের দীপ্তি। এইরূপ আনন্দ দেখা গেছ্‌লো—গ্রীস্‌ দেশের মহাপণ্ডিত আর্কিমিডিসের মুখে একদিন। শোনাই এখন সেই কথা তোমাদের। সেখানকার রাজা এক সোনার মুকুট তৈরি করিয়েছেন, এক স্যাক্‌রার দ্বারা। আর্কিমিডিসের তখন খুব নাম-ডাক—বিজ্ঞান-শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত বলে'। রাজা তাঁকে বল্‌লেন—এই মুকুট খাঁটি সোনার কিনা পরীক্ষা করে' তোমাকে বল্‌তে হবে। এ-ও বলে' দিচ্ছি—এই মুকুটের কোনো জায়গা তুমি পোড়াতে পার্‌বে না—এমন কি, কষ্টি পাথরেও ঘস্‌তে পারবে না। আর্কিমিডিস মুকুট নিয়ে গেলেন—তাঁর পরীক্ষা করবার ঘরে। বিষম সমস্যায় পড়েছেন, তিনি। সোনা পুড়িয়ে তাঁর পরীক্ষা করা চল্‌বে না—এমন কি কষ্টি পাথরে ঘসেও। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে! কিছুই ঠিক করতে পারছেন না, তিনি। ভাব্‌তে ভাব্‌তে গেলেন—স্নানের ঘরে। কাপড়-চোপড় ছেড়ে নাম্‌লেন জলের চৌবাচ্চায়। আধ-ভাসা অবস্থায় বুঝ্‌লেন—তাঁর শরীরটা যেন হাল্‌কা বোধ হচ্ছে! কেন এমন হয়! ভাব্‌তে ভাব্‌তে তাঁর মনে হ'ল শরীরটার যে-অংশটা জলে ডুবেছে, চৌবাচ্চা হ'তে ততটা জল বেরিয়ে গেছে—সেই জলের জায়গা হ'তে। নীচের জল উপরের জলটাকে ধরে' থাকে। কাজেই, নীচের জল উপরের জলকে যে-বলে ধরে' থাক্‌তো সেই বলে তাঁর শরীরটাকেও ধরে' আছে। তাই সেই বেরিয়ে-যাওয়া জলের ওজন-পরিমাণ ভারও তাঁর কমে' গেছে। এই সত্য আবিষ্কার

করে' আর্কিমিডিসের যে কত আনন্দ হয়েছিল, তা তোমরা বুঝ্‌তে পারো। আনন্দ খুব বেড়ে উঠেছিল। তাই তিনিও "পেয়েছি পেয়েছি" বলে' সেই খোলা-গায়েই স্নানের ঘর হ'তে বেরিয়ে এসেছিলেন।

এখন বিদ্যাসাগর পরাশর সংহিতার ঐ শ্লোকটিকে ধরে' যুক্তির দ্বারা একখানি বই লিখে ফেল্‌লেন। সেই বইয়ে তিনি বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না, তার প্রমাণ করেছিলেন। পিতা ঠাকুরদাস আর মা ভগবতী দেবার মত নিয়ে তিনি বইখানি ছাপিয়ে ফেল্‌লেন। ঠিক এই সময়ে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছিল—লোকের চক্ষুশূল, শুভকার্যে বাধা, ঘরের বালাই কচি বিধবাদের চোখের জলের দিকে।

বইখানি বেরিয়েছিল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে—আজ হ'তে একশ ছয় বছর আগে। বই বের হবা মাত্র ভারতের চারদিকে আগুন ধরে' গেল। সব জায়গাতে বিদ্যাসাগরের, আর বিধবা বিবাহের আলোচনা চল্‌লো। কত দিক্ হ'তে প্রতিবাদ আস্‌তে লাগ্‌লো। কেউ কেউ বা বই বের করে' বিদ্যাসাগরের ভুল ধরে' বাহাদুরী নিতে আরম্ভ করলো। কেউ কেউ বা গালাগালি দিতেও ত্রুটি করলো না। কিন্তু এতে বিদ্যাসাগর ভ্রূক্ষেপও করেন নি। বহু লোকের আগ্রহে ১৮৫৬ সালের ২৬এ জুলাই তারিখে বিধবা-বিবাহ আইন পাস্ হ'য়ে গেল। এইবার বিদ্যাসাগর নাম্‌লেন তাঁর কার্যক্ষেত্রে। তা'র উদ্যোগ-আয়োজন চল্‌তে লাগ্‌লো। বিবাহ দেবার উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীও পাওয়া গেল। পাত্র—শ্রীশচন্দ্র

বিদ্যারত্ন আর পাত্রী দশবছরের বিধবা কন্যা কালীমতি দেবী। পাত্রীর বাবার নাম ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়। বাড়ী ছিল তাঁর বর্ধমান (আজ কাল বাঁকুড়া) জেলার অন্তর্গত পলাশডাঙ্গা গ্রাম। ব্রহ্মানন্দ তখন জীবিত ছিলেন না—তাঁর বিধবা স্ত্রী লক্ষ্মীমণি দশবছরের কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে সকলের আগেই বালিকা বিধবা কন্যার পুনরায় বিয়ে দিতে সাহস পেয়েছিলেন! ধন্য তাঁর সাহস! এই অংশ লিখ্‌ছি আমি সেই পলাশডাঙ্গা গ্রামে—ব্রহ্মানন্দর ভিটার কাছে বসে'। গর্বে আমার বুক ফুলে উঠ্‌ছে—এই গ্রামেরই এক নারী কুসংস্কারের বেড়া-জাল ভেঙে বেরিয়ে আস্‌তে পেরেছিলেন—সকলের আগে—এই শুভ বিবাহের পুরোধা রূপে। এই বিবাহের সব খরচ বিদ্যাসাগরই করেছিলেন। সেই সময়ে যতগুলি বিধবার বিবাহ হয়েছিল—বিদ্যাসাগর প্রায় তাদের সব-গুলিরই খরচ চালিয়েছিলেন। শুনে সুখী হবে তোমরা, বিদ্যাসাগরের ছেলে নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নও এক বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

এইরূপে কয়েকটি বিধবার বিয়ে হ'য়ে গেল। অনেকক্ষণ পড়্‌ছো তোমরা এই বিধবা-বিবাহের কথা। এবার তা'র দু-একটা গল্প বলি শোন:—দেশের চারদিকেই এই বিধবাবিবাহের কথা। শান্তিপুরের তাঁতিরাও তাদের কাপড়ের পাড়ে তুল্‌লো—গান—

"সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।"

এই গান-তোলা-পাড় কাপড় হু-হু করে' কাটতে লাগ্‌লো। তা'রা

এই ব্যাপারে বেশ দু-পয়সা কামিয়ে নিয়েছিল—বুঝ্‌তেই পারছো।

আর একটা গল্প বলি শোন :—তোমাদের আগেই বলেছি—কল্‌কাতার কেউ কেউ এই বিধবা-বিবাহ চালাবার জন্যে বিদ্যাসাগর উঠে' পড়ে' লেগেছেন জেনে তাঁকে মেরে ফেল্‌তে লাগিয়েছিল। একদিন বিদ্যাসাগর আস্‌ছিলেন কোনো জায়গা হ'তে; অনেকটা রাত হ'য়ে গেছে। ঠন্‌ঠনের কালীবাড়ীর কাছে এসে পৌঁছেছেন তিনি; পেছন ফিরে দেখ্‌লেন—কয়েকটা লোক যেন তাঁর পেছনে পেছনে আস্‌ছে। বুঝ্‌তে তাঁর বাকি রইলো না—তা'রাই গুণ্ডার দল। বিদ্যাসাগরের বাবা ঠাকুরদাস বীরসিংহের বাড়ীতেই খবর পেয়েছিলেন—বিদ্যাসাগরের এই বিপদ যেন ঘনিয়ে এসেছে। জেনেই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—শ্রীমন্তকে—বিখ্যাত লাঠিয়ালকে। বিদ্যাসাগর পেছনের লোকদের দেখে ডাক্‌লেন—ছিরে, আছিস্ রে! শ্রীমন্ত জবাব দিল—ভয় নেই, আগিয়ে চলুন—হাতে আমার সেই লাঠিটাই আছে। শুনেই দিল গুণ্ডার দল অন্ধকারে গা ঢেকে—গলির মধ্যে। বিদ্যাসাগর তাঁর বাড়ীতে ফিরে এলেন। পরদিন করলেন কি জানো? যে বড়লোকটি ঐ গুণ্ডার দলকে তাঁর পেছনে লাগিয়েছিলেন তাঁকে মেরে ফেল্‌তে, সেই ভদ্রলোকের নাম জেনে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির! গুণ্ডার দল বাবুর সংগে ঐ বিষয়েরই আলোচনা করছে তখন। বিদ্যাসাগর বল্‌লেন ঐ বাবুকে—"শুন্‌লাম আপনি নাকি আমাকে মেরে ফেল্‌বার জন্যে

কয়েকটি গুণ্ডা লাগিয়েছেন—কাল সন্ধ্যার পরে তাদের সংগে আমার শুভদৃষ্টিও হ'য়ে গেছে। তাই এলাম আপনার কাছে—এতো কষ্ট করছেন কেন আমাকে মেরে ফেল্‌তে। এই জন্যেই আমি এলাম আপ্‌নার বাড়ীতে—এই খানেই সে-কাজটা সেরে ফেলুন না। কেউ জান্‌বে না—শুন্‌বে না। কাজ হাঁসিল করে' আমার মৃতদেহটা ফেলে দেবেন—কোনোখানে। সব আপদ চুকে যাবে! দেখ্‌তো কত সাহস বিদ্যাসাগরের।

এত করে'ও বিধবা-বিবাহ চালু হয় নি। বিদ্যাসাগর একাই নেমেছিলেন এই দুঃসাহসের কাজে। এখন সহায় হলেন তাঁর দেশের অনেক বড় বড় লোক। ব্রাহ্ম সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকগণও বিদ্যাসাগরের এই কাজে অনেক সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের চেষ্টাতেও অনেক কাজ হয়েছিল। বিধবা বিবাহ চালু করে' বিদ্যাসাগর নাম্‌লেন, আর এক কাজে। সে-কাজটা কি জানো? বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করে' দেবার চেষ্টা। এজন্যে তিনি উঠে' পড়ে' লাগ্‌লেন। এখন সেই কথাই বলি:—বল্লালসেন যখন বাংলার রাজা, তখন তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে যাঁরা বেশ সদাচারী, বিদ্বান, ভদ্র, খ্যাতনামা, তপস্যা-দান ইত্যাদি গুণে গুণবান, তাঁদের স্বসমাজের মধ্যে 'কুলীন' বলে' সম্মান করেছিলেন। কিছুদিন পরে দেবীবর ঘটক সেই কুলীনদের মধ্যে 'মেল' বেঁধে দিয়েছিলেন। সুযোগ পেয়ে কুলীনদের মধ্যে অনেকে কয়েকটি করে' বিয়ে করতে সুরু করলেন। এমনও হ'য়েছিল—এক একটি কুলীনের ছেলে

৬০।৭০ পর্যন্ত বিবাহ করেছিলেন। তা'তে হ'তো কি জানো? সেই-সব কুলীন-কন্যা শ্বশুর বাড়ী কি জিনিষ, তা বুঝ্‌তেন না—বাপের বাড়ীতেই তাঁরা থাকৃতে বাধ্য হ'তেন। এতে অনেক রকম গোলমালও হ'তে লাগ্‌লো। কুলীনের ছেলেরা সেই যে বিয়ে করে' গেলেন, তারপর তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের কোনো খবরই রাখ্‌তেন না। দু-বছর পাঁচ বছর অন্তর একবার দয়া হ'ল তো শ্বশুর বাড়ী এসে স্ত্রীকে দেখে যেতেন। এই কুলীনের ছেলেদের এইরকম ব্যাপার দেখে বিদ্যাসাগরের প্রাণ কাঁদ্‌লো। তিনি এর প্রতিকারের চেষ্টায় লেগে গেলেন। সহায় হয়েছিলেন তাঁর—বর্ধমানের রাজা মহাতাব্‌ চাঁদ, নবদ্বীপ আর দিনাজপুরের রাজারা, তা ছাড়া অনেক নামজাদা লোক—এমন কি, অনেক অধ্যাপক ও টোলের পণ্ডিতরা পর্যন্ত। বিদ্যাসাগর এক হুগলী জেলার ১৯৭ টি কুলীন-পুত্রের ১২৮৮ টি বিবাহের খবর পেয়েছিলেন। বল্‌তে লজ্জা হয়—এক কুলীন-পুত্র ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে ৮০ টি ও আর এক মহাশয় ১০৭ টি বিবাহ করেছিলেন!! তোমরা আরো শুন্‌তে চাও? একটি চার বছরের ছেলের গলায় দু'টি আর একটি চার বছরের ছেলের গলায় পাঁচটি বৌ!! হায় হতভাগ্য বঙ্গ-সমাজ!

এই কুপ্রথা বন্ধ করে' দেবার জন্যে পঁচিশ হাজার লোকের সই-করা প্রার্থনা-পত্র পাঠানো হয়েছিল সেই সময়ের ছোটলাট বিডন সাহেবের কাছে। বিডন সাহেব—শুধু "চেষ্টা ক'রবো"—এই কথাই বলেছিলেন। নানা কারণে বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলন সফল হয় নাই।

এ-বিষয়ে একটা গল্প বলি শোন ঃ—আমি (লেখক) তখন সোনামুখী হাইস্কুলের শিক্ষক। ফাল্গুণ মাস—বৈকাল ৪।। টা। ছেলেরা খেলা করছে স্কুলের খেলার জায়গায়। আমি বসে' আছি—খেলার মাঠে একটা প্যারালেল বারের ওপর। একটি ফুটফুটে ৩০।৩২ বছরের যুবক আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করে' জান্‌লাম—তাঁর নাম কেদারনাথ……। জিজ্ঞাসা করলাম— কোথায় যাবেন? বল্‌লেন—এই গ্রামেই এসেছি— ……বাঁড় য্যে মশাইয়ের বাড়ী। বলা বাহুল্য, আমি সেই বাঁড় য্যে মশাইকে খুব ভালো ক'রেই জান্‌তাম। জিজ্ঞাসা করলাম বাঁড় য্যে মশাই আপনার কে হন্? উত্তরে জান্‌লাম—তাঁর মামা-শ্বশুর। কেদার বল্‌লেন, এই দ্বিতীয়বার আস্‌ছি আমি। তাঁর বাড়ী চিন্‌তে পারবো না—দয়া করে' সেই পাড়ার একটি ছেলেকে আমার সাথে দিন্— আমাকে তাঁর বাড়ী দেখিয়ে দেবে। এইখানে বলে' রাখি…তিনি আমার নাম, বাড়ী, কি কাজ করি, কোথায় থাকি, ইত্যাদি জিজ্ঞাসাও করেছিলেন। আর আমিও তাঁকে আমাদের বোর্ডিংঘরে নিয়ে গিয়ে জলখাবারও খাইয়েছিলাম। ছেলেটির সংগে কেদারনাথ চলে' গেলেন। রাত্রে আহারাদির পরে আমরা শুয়ে আছি— এমন সময়ে আমার নাম ধরে' কে যেন ডাক্‌ছে মনে হ'ল। বল্‌লাম—কে? উত্তর এল—আমি কেদার!—এত রাত্রে যে! —দোর খুলুন, বল্‌ছি পরে। দোর খুল্‌লাম। কেদারনাথ এসে বস্‌লেন—আমার বিছানায়। বল্‌তে লাগ্‌লেন—"এত ছোট লোক!! আমার পা-ধোওয়ার ৫৲ টাকা আর বিদেয়-টা দিতে

চাইলে না !!—বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি রকম ? তিনি বল্‌লেন—আমি নৈকষ্য কুলীনের সন্তান—তাঁর ভাগিনেয়ীকে বিয়ে করেছি—প্রায় ৬ বছর আগে। বিয়ের পর এই এসেছি। অম্‌নি পা ধোবো তাঁর বাড়ীতে ! আমি বেশী কিছু চাই নি—চেয়েছিলাম—মাত্র ৫৲ টাকা আর ধুতি-চাদর। বলে কিনা ২৲ টাকা দেবো। এইরূপ কথাবার্তা হচ্চে—···বাঁড়ুয্যে মশাই এসে হাজির। আমি অনেক বলে' কয়ে' খোসামোদ করে' দু-টাকা এখন পা-ধোবার জন্য দেবেন—আর বিদেয়ের সময় ৩৲ টাকা আর ধুতি-চাদর দেবেন বলে' কেদারকে বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের সংগে পাঠিয়ে দিলাম। কেদার যাবার সময়ে বল্‌লেন—যদি না দেন ? আমি বল্‌লাম—তার জন্যে ভাব্‌বেন না—আমি দায়ী রইলাম। কেদার চলে' গেলেন। কুলীন-পুত্রদের এমনও ব্যাপার আছে !!!

বিদ্যাসাগর শুধু বিধবা-বিবাহ প্রচলন আর বহুবিবাহ বন্ধ করার কাজেই আত্মনিয়োগ করেন নি। তা-ছাড়া তিনি সমাজ সংস্কার ও সমাজের উন্নতির জন্যেও অনেক চেষ্টা করেছিলেন।

পৃথিবীতে যাঁদের মহাপুরুষ বলা হয় তাঁরাই জাতির জনক। তাঁদের জন্মগ্রহণে জাতির হয় কল্যাণ—সমাজ-দেহে আসে শক্তি, ধর্মে আসে—কুসংস্কার দূর করে' পবিত্র করবার সাহস। তাই বিদ্যাসাগর সমাজের উপরে আঘাত হেনে তা'র মধ্যে যেটা অসার তা'কে দূরে ফেলে দিয়ে সার-সত্যকে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন মানুষ। তাই মানুষের চিন্তায় তাঁর প্রাণে জেগে উঠেছিল মনুষ্যত্ব।

কয়েকটি গল্প

এইবার তোমাদিগকে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প বল্‌বো! গল্প বল্‌তে তোমরা সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর কথা—পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা—ডালিমকুমারের কথা—এই রকম আজগুবী গল্প মনে কোরো না। বিদ্যাসাগর-জীবনে এগুলি সবই সত্যি। এই জন্যে এগুলি গল্প হ'লেও সত্যি। এর আগে তোমাদিগকে বিদ্যাসাগরের বিষয়ে অনেক কথা বলেছি। এখন শোনাই তোমাদিগকে কয়েকটি খুব মজার গল্প।

(১)

তোমরা শুনেছ ঈশ্বরচন্দ্রের (তখন তিনি বিদ্যাসাগর হননি) ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। তাঁর হৃদয়টা কিন্তু শুক্‌নো-কাঠ ছিল না। সেই বয়সেও তাঁর প্রাণে খেল্‌তো আনন্দের প্রস্রবণ। বিয়ে হ'য়ে গেছে; বর-ক'নে বাসর-ঘরে এসেছেন। যেমনি তিনি বাসর-ঘরে ঢুকেছেন, হুকুম হ'ল বাসর জাগাবার জন্যে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কাছ থেকে তোমার ক'নে খুঁজে বের কর। ছোট্ট ন-বছরের ক'নেটিকে ছান্‌লা-তলায় শুভ-দৃষ্টির সময়ে একবার মাত্র দেখেছেন; ক'নেকে খুঁজে বের করবেন কিরূপে! ঘরের ভিতরটা ভালো করে' কয়েকবার চেয়ে দেখ্‌লেন—সন্ধান পেলেন না। শেষে করেছিলেন কি জানো? ঈশ্বরচন্দ্র তাঁরি বয়সের একটি টুক্‌টুকে ফর্‌সা মেয়ের হাতটা ধরে' বলেছিলেন—

এই আমার ক'নে। সেই মেয়েটিকে ধরবামাত্র একটা গোলমাল পড়ে' গেল—বাসর জাগাবার জন্যে যে-সব মেয়ে এসেছিলেন, তাঁরা তো হেসেই গড়াগড়ি। ঈশ্বরচন্দ্র সেই মেয়েটির হাত খুব জোর করে'ই ধরেছেন। মেয়েটি বাপ্‌রে, মারে, গেলামরে—বলে' চীৎকার করে' উঠ্‌লো। গিন্নী-বান্নী গোছের দু-একজন কাছে এসে বল্‌লেন—ও তোমার ক'নে নয়—ওকে ছেড়ে দাও। সেই মেয়েটিও বল্‌লো—আমাকে ছেড়ে দাও—আমি তোমার ক'নে বের করে' দিচ্ছি। এই বলে' সেই মেয়েটি ক'নেটিকে এনে হাজির করলো। দেখ্‌লে ঈশ্বরচন্দ্র কেমন ঠাট্টা-তামাসা কর্‌তে ভালোবাস্‌তেন।

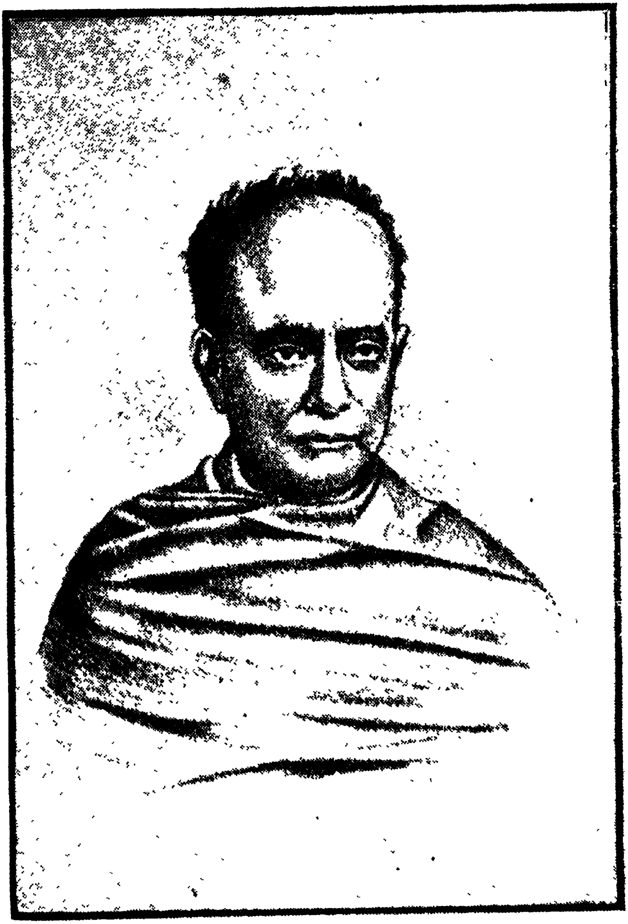
(২)

ঈশ্বরচন্দ্র তখন সংস্কৃত কলেজে পড়েন। কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকার মশাই একবার "গোপালায় নমোঽস্তু মে", এইটিকে চতুর্থ চরণ করে' সব ছেলেকে শ্লোক লিখ্‌তে বলে-ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র চুপ্‌চাপ্‌ বসে' আছেন; অধ্যাপককে কাছে আস্‌তে দেখে তাঁকে বলেছিলেন—এখন বলুন তো আমরা কোন্ গোপালের বিষয় লিখ্‌বো? এক গোপাল তো আমার সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে আছেন—আর এক গোপাল বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন, শুনেছি। কার কথা নিয়ে শ্লোক লিখি বলুন? ছাত্রের এই মজার কথা শুনে তর্কালংকার ছাত্রের হাসির সাথে আপনার হাসি মিলিয়ে বলেছিলেন—বৃন্দাবনের গোপালের বিষয়েই শ্লোক

লেখ। ছাত্র আর অধ্যাপক দু'জনের মধ্যে হাসির বিনিময় হ'য়ে গেল। শুনলে—ঈশ্বরের দুটি রসিকতার গল্প।

(৩)

ঈশ্বরচন্দ্র এখন বিদ্যাসাগর হয়েছেন। চারদিকেই তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। কত বড় বড় লোক, সাহেব-সুবা, এমন কি ছোট লাট, বড় লাট পর্যন্ত তাঁর খাতির করেন। আবার তিনি গরীবের মা-বাপ্। যেখানে যান তিনি, সেই খানেই দান-সত্র খুলে বসেন। তিনি বাড়ীতে এলেই কত লোক তাঁর কাছে নিজেদের অভাব জানাতো। বিদ্যাসাগর কাউকে দিতেন—ওষুধ, কাউকে দিতেন খাবার, আবার কাউকে দিতেন নতুন কাপড়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো। তিনি তাদের হাতে দিতেন নতুন চক্‌চকে টাকা, আধুলি, সিকি, দুআনী, পয়সা ইত্যাদি। তাঁর এই রকম দানের ব্যাপার দেখে সেই দেশের কতকগুলো দুষ্টু লোক মনে করেছিল ঠাকুরদাসের ঘরে অনেক টাকাকড়ি আছে। এই জন্যে ৫০।৬০ জন জুটে তাঁর ঘরে ডাকাতি করতে এলো। বিদ্যাসাগর তত লোক দেখে একলা কি কর্‌তে পারেন! বাড়ী হ'তে বের হ'য়ে গেলেন—খিড়কী দরজা দিয়ে। ডাকাতরা তো টাকা-পয়সা তেমন কিছু পেলো না। পেলে—কতকগুলো ঘটি, বাটী, থালা, গেলাস—আর কয়েকখানা কাপড়-চোপড় মাত্র। ডাকাতির খবর গেল—থানা ঘাঁটালে। থানার দারোগা এলেন—সদলবলে। তখনকার



পরিণত বয়সে—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর--২৬ পৃঃ

থানার লোকেরা এই সব ব্যাপারে কারো বাড়ীতে এলেই একটু মোটা রকমের দক্ষিণার আশা করতেন। ঠাকুরদাসের ঘরে তো এ-সব কিছু পাবার আশা নাই। দেখে খুবই চটে' গিয়েছিলেন। লোকের দ্বারা ঠাকুরদাসের কাছে 'পূজার' খরচ চেয়ে পাঠালেন। ঠাকুরদাস বলেছিলেন—আপনি কুলীনের ছেলে, আপনার সম্মান করতে পারি। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আপনাকে কিছু দিতে পারি না। বলে'ই ঠাকুরদাস নিত্যকার ব্যবহারের থালা, বাটী, ঘটি আর কাপড় কেনবার জন্যে চলে' গেলেন—অন্য জায়গায়। আর বিদ্যাসাগর কতকগুলো ছেলের সাথে সেই জায়গায় খেলতে আরম্ভ করে' দিলেন—হা-ডু-ডু-ডু ; যেন কোনো বিপদই ঘটে নাই। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের এইরকম বে-পরোয়া ভাব দেখে দারোগা সাহেবের সর্বাংগটা জ্বলে' পুড়ে' ছাই হ'য়ে যাবার জো হয়েছিল। দারোগা বলেছিলেন—এদের এমন কি জোর যে, আমার মুখের ওপর বলতে পারলো—কিছুই দিতে পারবো না। ঈশ্বরচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললো—আর ছোঁড়াটাই বা কি রকম! বেহায়ার মতো ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে আর হা-ডু ডু-ডু খেলছে। শুনেই গাঁয়ের ফাঁড়িদার বললো—হুজুর! উনি সামান্য লোক নন্; উনি বাড়ী এলে জাহানাবাদের ডেপুটী বাবু আসেন ওঁর সাথে দেখা করতে! আর এমনো আমরা শুনেছি—দেশের ছোট লাট আর বড় লাটের সাথেও এঁর বন্ধুত্ব আছে। এই কথা শুনেই দারোগা বাবু আর কিছু না বলে' থানায় ফিরে গেলেন।

বিদ্যাসাগর কল্‌কাতায় ফিরে এসেছেন। ছোট লাট খবর পেয়েছেন—বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে ডাকাতি হ'য়ে গেছে। একদিন বিদ্যাসাগরের সংগে ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের দেখা হ'ল। তিনি ডাকাতির কথাটা পাড়লেন। সব পরিচয় দিয়ে বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—দেখ্‌লাম ডাকাতের দলে ৫০।৬০ জন লোক। বাড়ীতে আমি, আর আমার বুড়ো বাবা। তাদের সাম্‌নে কি করে' যাই। অনেক ভেবে-চিন্তে আমরা বেরিয়ে গেলাম খিড়কী দরজা দিয়ে। শুনেই লাট সাহেব বল্‌লেন—এতগুলো ডাকাত পড়লো তোমার বাড়ীতে, আর তুমি পালিয়ে গেলে তাদের বাধা না দিয়ে খিড়কীর পথে! আচ্ছা বীরপুরুষ তো তুমি!

শুনেই বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—আপনারা তো ভারী মজার লোক—এত লোককে বাধা দিতে গিয়ে যদি মারা পড়্‌তাম, তা হ'লে আপনারা বল্‌তেন—আচ্ছা আহাম্মক তো! এত লোককে বাধা দিতে গেলে—হাতে কোনো অস্ত্র নেই—পড়্‌বো মারা। তাই বেরিয়ে গেলাম—পেছনের দরজা দিয়ে। তা'তে বল্‌লেন কি না—কাপুরুষ! এগোলেই বিপদ—পেছলেও বিপদ্! কেমন জবাব বলতো।

(৪)

মায়ের ব্যবহারের জন্যে যা যা জিনিষের দরকার হ'ত, বিদ্যাসাগর তা কল্‌কাতা থেকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন। মা একবার বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—বাড়ীর জন্যে ৬ খানা লেপ

পাঠিয়ে দিয়ো। বিদ্যাসাগর ৬ খানা লেপ পাঠিয়ে দিলেন। আর পাঁচজনকে দিয়ে মা ভগবতীর একখানা লেপ ছুট্‌লো। সকাল বেলা—অনেকেই আপনার আপনার কাজে আছে। ভগবতী দেবী একটু রোদে বসে' আছেন। এমন সময়ে একটি মেয়ে ছোট্ট একটি ছেলেকে নিয়ে তাঁর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। ছেলেটির আদুড়-গা। শীতে একটু একটু কাঁপছে, মনে হচ্ছে। মেয়েটি বল্‌লে মা, শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছি—রাতে শীতের জন্যে ঘুমুতে পারি না। আমাকে একখানি কাপড় দাও। শুনে মা ভগবতী বল্‌লেন—দ্যাখ্‌, কাপড় তো তেমন নেই—একখানা লেপ নিবি। মেয়েটি বল্‌লে—মা, এমন ভাগ্‌গি করেছি যে, লেপ গায়ে দিয়ে শুতে পারবো! মা বল্‌লেন—আহা ছেলেটি শীতে কেমন সিঁট্‌কে গেছে—বোধ হয় রাতে শীতে খুবই কষ্ট পেয়েছে। মেয়েটি বল্‌লে—মা, শুধু ও-কথা কেন, সব-দিন ছেলেটির পেটে দুটো ভাত দিতেও পারি না। আহা বেচারা—ক্ষিদেয় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে! শুনেই ভগবতী দেবী ঘরের ভিতর গিয়ে তাঁর গায়ে-দেবার লেপখানি এনে সেই মেয়েটিকে দিলেন। সেই মেয়েটি—লেপ খানিই শুধু নয়—কিছু চাল-মুড়িও পেয়েছিল।

বড়দিনের ছুটি হয়েছে। বিদ্যাসাগর বাড়ী এসে পেঁ'ছলেন—সন্ধ্যের পরেই। খেঁ'াজ করলেন—মা কোথায়! খবর পেলেন, তিনি উনুনের পাশে বসে' আছেন। পৌঁছলেন তিনি মায়ের সাম্‌নে। জিগ্‌গেস্‌ করলেন—ওখানে অমন করে' বসে' কেন,

মা! মা বল্‌লেন—বড় শীত করছে বাবা। তাই উনুনের পাশে একটু বসে' আছি। রাত্রে শীতটা খুবই বেশী বোধ হচ্ছে। তাই যতক্ষণ পারি, এই খানেই বসে' থাকি। বিদ্যাসাগর জিগ্‌গেস করলেন—শীতে কষ্ট পাচ্চ কেন, মা! তোমার কি লেপ নেই? মা বল্‌লেন—না, বাবা, সেদিন একটি মেয়ে তা'র একটি ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল—তা'র কষ্ট দেখে সেই লেপখানি তাকে দিয়ে দিয়েছি। শুনে হাসির তরংগ তুলে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—বেশ করেছ মা; এখন বলতো ক'খানি লেপ হ'লে তোমার গায়ে একখানি লেপ জুট্‌বে? বল্‌লেন মা, তা হ'লে তোর কল্‌কাতা যাবার আগের দিন ঠিক করে' বল্‌বো। বলা বাহুল্য, মা ভগবতী যা বলেছিলেন তা'র চেয়ে আরো একখানি বেশী লেপ পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন, মা, তুমি য-খানা লেপ পাঠাতে বলেছিলে তা ছাড়া আর এক খানা বেশী লেপ পাঠিয়েছি। আমার মনে হয়, এবারে তোমার গায়ে একখানা লেপ জুট্‌বে। দেখতো মায়ে-পোয়ে কেমন মজার কথার আলোচনা হ'ত!

(৫)

বিদ্যাসাগর এলাহাবাদ স্টেশনের প্লাট্‌ফরমে বেড়াচ্ছেন। লালা বংশীধরের কুঠিতে যাবেন। যে-ট্রেণে তাঁদের এলাহাবাদে আস্‌বার কথা, সেই ট্রেণের আগের ট্রেণেই তাঁরা এলাহাবাদে এসেছেন; এজন্যে বংশীধরের লোক স্টেশনে ছিল না। এক

ঘণ্টা পরেই ট্রেণ আস্‌বে। সংগের লোক এক জায়গায় অপেক্ষা করছে—তিনি তাঁর গায়ের মামুলি মোটা চাদর আর সেই চটিজুতা পরে'ই আছেন। তাঁর মাথায় সাম্‌নে চুল ছিল না—ছবিতে বোধ হয় দেখেছ। তখনকার যুবকরা যেমনভাবে চুল আঁচড়াতেন তাঁর সে-সব বালাই ছিল না। চেহারা আর পোষাক দেখে কেউ বুঝ্‌তে পারতো না—তিনি কত বড় লোক। আমি পয়সায় "বড়লোক"-এর কথা বল্‌ছি না। তিনি কত বড় পণ্ডিত—দয়ার সাগর—বিদ্যাসাগর, চেহারা দেখে তা কেউ অনুমান করতে পারতো না। পাঁচ সাত মিনিট পরেই একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ এসে দাঁড়ালো,—প্লাট্‌ফরমে। একটা কামরা হ'তে নাম্‌লেন একটি ফুটফুটে যুবক। তাঁর হাতে ছোট্ট একটি হ্যাণ্ডব্যাগ। নেমেই "কুলি কুলি" করে' ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। সেদিন সে-ট্রেণের সময়ে প্লাট্‌ফরমে বেশী কুলি ছিল না। বাবুটি তো কুলির দর্শন না পেয়ে কত কি ভাব্‌ছেন—ব্যাগটা হাতে নিয়ে যাবেন কি করে'! কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন—বিদ্যাসাগর। বাবুটির অবস্থা দেখেই বিদ্যাসাগর হিন্দীতে বল্‌লেন—কাঁহা জানে হোগা, বাবু! বাবুটি বল্‌লেন—এই গাড়ী-বারান্দা। বিদ্যাসাগর, বাবুর ব্যাগটি হাতে নিয়ে বাবুর পেছনে পেছনে গিয়ে স্টেশনের গাড়ী-বারান্দায় পৌঁছলেন। দেখ্‌লেন—সেদিন কি একটা কাজে স্টেশনে গাড়ী, টাঙ্গা, এক্কা কিছুমাত্র নেই। বাবুটি বল্‌লেন—আমাদের বাড়ী খুব কাছেই—সাগঞ্জে—আধ মাইলও হবে না। বিদ্যাসাগর তেমনি হিন্দীতে বল্‌লেন—"চলিয়ে বাবু!" একটু পরেই তাঁরা

সাগঞ্জে পৌঁছলেন। কুলি বিদ্যাসাগর, বাবুর হাতে ব্যাগটা দিলেন। বাবু মণিব্যাগটা বের করে' খুলে একটা দুআনী বের করে' 'কুলির' হাতে দিতে গেলে—কুলি বিদ্যাসাগর এবার পরিষ্কার বাংলায় বল্‌লেন—এ পয়সায় আমার দরকার নেই বাবু! এই পয়সাটা কোনো গরীব-দুঃখীকে দান করে' দেবেন। 'কুলির' মুখে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে বাবুটি অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বাড়ী কোন্ জেলায়। উত্তর পেলেন—মেদিনীপুর। বাবু বল্‌লেন—তুমি তো বাঙালী তবে কুলির কাজ কর কেন? বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—কুলির কাজ তো করিনে বাবু······আমার কাজ অনেক আছে। দেখ্‌লাম, আপনি ঐ এক সের ওজনের হ্যাণ্ড-ব্যাগ্‌টা স্টেশনের গাড়ী-বারান্দা পর্যন্ত আন্‌বার জন্যে কুলি খুঁজ্‌ছেন—তাই দেখে আপনাকে কষ্ট হ'তে রেহাই দেবার জন্যে আপনার বাড়ী পর্যন্ত এসেছি। বাবু, আপনাকে বলে' যাই······যতটা পারেন নিজের কাজ করে' যাবেন। এতে তো লজ্জার কথা কিছু নেই। এই বলে' হন্ হন্ করে' গলির পথে এগিয়ে চলেছেন। কাছেই একটা একতালা বাড়ীর বাইরের দিকে একজন যুবক একখানা বই হাতে করে' কি পড়্‌ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়্‌লো গলির পথে তাড়াতাড়ি আস্‌ছেন বিদ্যাসাগর। ঐ যুবকটি যে মেট্রোপলিটান কলেজ হ'তে পাস্ করে' আইন পড়ে' এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি ভালো করে'ই চিন্‌তেন। বিদ্যা-সাগরের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর পা-দুটি ছুঁয়ে প্রণাম করলেন

দেখেই বিদ্যাসাগর বলে' উঠ্‌লেন—শঙ্কর! এখানে কি করছিস্‌ রে। শঙ্কর বল্‌লেন—আমি এখানে হাইকোর্টে ওকালতি করি। আমার বাসায় পায়ের ধূলো দিলে আমি ধন্য হবো। বিদ্যাসাগর এলাহাবাদে কি জন্যে এসেছেন জানিয়ে বল্‌লেন—আমি এখন এলাহাবাদে কিছুদিন থাক্‌বো—আজ আমাকে ছেড়ে দে! এক দিন তোকে খবর দেবো—আমার সাথে দেখা করিস্‌। এই বলে'ই চলে' যাবেন তিনি। এমন সময়ে যাঁর ব্যাগ বিদ্যাসাগর ব'য়ে এনেছিলেন—সেই বাবুটি কৌতূহলী হ'য়ে বেরিয়েছেন তাঁর কুলির পরিচয় পাবার জন্যে। দেখ্‌লেন, শঙ্কর বাবুর সংগে তাঁর কথাবার্তা হচ্ছে। কথাবার্তা শুনে জান্‌লেন—ঐ ব্যক্তি আর কেউ নয়—বিদ্যাসাগর! শুনেই তিনি বিদ্যাসাগরের পা জড়িয়ে ধরে' ক্ষমা চাইতে লাগ্‌লেন—আর বল্‌লেন—আপনি আমাকে খুব শিক্ষা দিয়েছেন—আপনি আমার গুরু। গুরুর কাছে উপদেশ পেলাম—নিজের কাজ নিজে করতে লজ্জা নেই। ভবিষ্যৎ জীবন আমি এই মহামন্ত্র জপ করে'ই কাটাবো। বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—তাই কোরো বাবা। এঁকে আজ 'করিস্‌' কথাটা বলেন নি তিনি। পেলে বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের পরিচয়। *

(৬)

তোমাদের আগে বলেছি—যতগুলি বিধবা বিবাহ হ'ত তখন,

* এই ঘটনাটি আমি এইভাবে শুনেছিলাম এলাহাবাদের এ, জি, আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের নিকট হ'তে' —লেখক।

বিদ্যাসাগর কন্যা-পক্ষে থেকে তা'র সমস্ত খরচ চালাতেন। এই রকম খরচ হ'তে হ'তে তাঁর অনেক টাকা দেনা হ'য়ে গেল। সর্বস্বান্ত হ'য়ে গেলেন বল্‌লেই হয়। তাঁর এক বন্ধুর নাম মধুসূদন স্মৃতিরত্ন। তিনি একদিন তামাসা করে' বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—আচ্ছা বিদ্যেসাগর, দেশে এত লোক থাক্‌তে তুমি কেন একাজে একা এগোলে? বিদ্যাসাগর তা'র উত্তরে বলে-ছিলেন—যখন আরম্ভ করেছিলাম, তখন কি আর একা ছিলাম! অনেক লোকে মিলে-মিশে একাজে হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু যারা "মায়ের ব্যাটা" তারা' চুপে চুপে সরে' গেল। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে গেল—আর আমি বাপের ব্যাটা—কাজে-কাজেই ধরা পড়ে' গেলাম। দেখো তো বিদ্যাসাগরের কত জোরের কথা।

(৭)

বিধবা-বিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগর মেতে আছেন। দেশের অনেক বড় বড় লোক এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন, বলেছিলেন। কিছুদিন দিয়েও ছিলেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে যে কুবেরের ধনেও টান পড়ে। ক্রমে ক্রমে অনেকেই গেলেন সরে'। এই বিষয় নিয়ে একদিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সংগে তাঁর কথাবার্তা হচ্ছে। একটি বিধবার বিয়ের খরচ আমাদের দেশের একজন রাজা দেবেন বলে-ছিলেন—কার্যকালে দেন নি। আর এক রাজা মেট্রোপলিটান স্কুল-ঘর তৈরি করার জন্যে কিছু সাহায্য দিতে স্বীকার করে-ছিলেন—তিনিও তাঁর কথা রাখেন নি। আর একজন রাজা তাঁর

ছাপাখানা হ'তে ভালো ভালো বই ছাপ্‌বার জন্যে কিছু সাহায্য করবেন বলেছিলেন। সেই জন্যেই তিনি অন্নদামঙ্গলের একটি ভালো সংস্করণ বের করেছিলেন। কার্যকালে সেই বীর পুরুষ রাজা অদৃশ্য হয়েছিলেন। দেনা শোধ করেছিলেন—সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ মার্শেল সাহেব ৬০০৲ টাকায় ১০০ খানা অন্নদামঙ্গল কিনে। তাই তিনি এ-দেশের রাজাদের ওপর খুব চটে' গিয়েছিলেন। শাস্ত্রি-মশাইয়ের সংগে সে-দিনের আলোচনায় তাঁর রাগের মাত্রা খুবই বেড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন কি জানো? তিনি বলেছিলেন—"আমাদের দেশে যে-সব রাজা আছেন, তাঁদের বেশীর ভাগের নাকের ডগায় আমি আমার চটি জুতোর ঠোক্কর মার্‌তে পারি।" দেখো তো কত জোরের কথা!

(৮)

বিদ্যাসাগর ছিলেন বিদ্যার সাগর। বুঝেছিলেন তিনি, বিদ্যার জোরে—সাধনার জোরে—এই বিশ্বের স্রষ্টিকর্তার অনন্ত করুণার তত্ত্ব। জাতি-নির্ণয়ের এই গভীর তত্ত্ব তিনি বুঝেছিলেন বলে' ব্রাহ্মণজাতীয় হ'লেই তিনি তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়্‌তেন না। আর তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান এজন্যে তাঁর অহংকারও ছিল না। একদিন এক পাড়া-গাঁ হ'তে এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসেন তাঁর সংগে দেখা কর্‌তে। নামাবলি—লম্বা আর্কফলা—চন্দনের তিলক, কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর শরীরে। অভাব ছিল তাঁর হৃদয়ে—জীব-প্রেম। তাই তিনি ব্রাহ্মণ-ছাড়া আর যাঁরা আছেন, তাঁদের ততটা শ্রদ্ধাও কর্‌তেন না। বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে যখন

এলেন তিনি, তখন দেখ্‌লেন বিদ্যাসাগর অনেক লোকের সংগে কথা বল্‌ছেন। তাঁরা ঐ পণ্ডিতকে দেখেই বুঝেছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু কেউই তাঁকে প্রণামও কর্‌লেন না—বিশেষ খাতিরও দেখালেন না। পণ্ডিত মশাই তো রেগেই আগুন! বিদ্যাসাগরের কাছে নালিশ কর্‌লেন—তোমার সংগে যে-সব লোক কথা বল্‌ছিল—তাদের মধ্যে কেউ-ই তাঁর উপর সম্মান দেখায় নি। দেশটা একেবারে উচ্ছন্ন গেছে। এ-জাতের কি মংগল হবে! ব্রাহ্মণের অপমান!! বিদ্যাসাগর সব বুঝে একটু চুপ করে' থেকে বলেছিলেন ব্রাহ্মণের সন্তান না হ'লেই কি তাদের আপনি ছোট লোক বল্‌বেন? রাজা রাধাকান্ত দেব তো ব্রাহ্মণ নন। তিনি আমাদের জন্যে কত কি করেছেন, বলুন তো! আমাদের মাথা যে আপনা হ'তেই তাঁর কাছে হেঁট হ'য়ে পড়ে। আপনি শাস্ত্র পড়েছেন। জানেন তো সে-সব। এই বলে'ই হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলেন—গোলোকের অধিপতি নারায়ণ তৃতীয় অবতারে বরাহ মূর্তি ধরেছিলেন। তাই বলে' কি আপনি বা আমি ডোম-পাড়ার শুয়োরগুলোকে দেখে নারায়ণ বলে' প্রণাম কর্‌বো? প্রণামের পাত্র হওয়া চাই,—রত্নাকর দস্যু হ'য়েও 'বাল্মীকি মুনি' হ'তে পেরেছিলেন। শক্তি চাই—বুকের পাটা চাই—প্রণাম অম্‌নি মেলে না। মানুষের আদর কত তাঁর কাছে, শুন্‌লে তো!

(৯)

বিদ্যাসাগর সকল মানুষের চেয়ে নিজেকে একটু আলাদা

করে'ই দেখ্‌তেন—গর্ব্বে নয়—মানবতার জোরে। তিনি ভাব্‌তেন—এক পোয়া চাল হ'লেই তো প্রাণরক্ষা হয়। তবে সেই প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অপরের খোসামুদী করবার দরকার কেন! সেই জন্যে তিনি ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের সংগে দেখা করতে যাবার সময়ে তাঁর সেই চিরকেলে পরণে সাদা ধুতি—গায়ে মোটা চাদর—পায়ে তালতলার চটি—এই পরেই যেতেন লাট-দরবারে। একদিন হ্যালিডে সাহেব বলেছিলেন—"পণ্ডিত, আপনি এ পোষাকটা ছাড়ুন; দেখুন তো আমার দপ্তরে আপনার দেশের লোকেরা কেমন ট্রাউজারস্‌, চোগা, চাপকান্‌, পাগড়ী পরে' আসেন—দেখ্‌তে কেমন সুন্দর মনে হয়।" বিদ্যাসাগর হ্যালিডে সাহেবের কথা রাখ্‌বার জন্যে দিনকয়েক সেই পোষাকেই এসেছিলেন। পাছে অপরে কেউ তাঁর এই পোষাক দেখ্‌তে পায়, এই জন্যে আস্‌তেন—চুপি চুপি। কিন্তু সেটা তাঁর ভালো লাগ্‌ছিল না। এই জন্যে তিনি এক দিন দপ্তরের কাজ সেরে আস্‌বার সময় হ্যালিডে সাহেবকে সবিনয়ে বলে' এলেন—আপনার সংগে এই দপ্তরে আমার শেষ দেখা! হ্যালিডে সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কেন পণ্ডিত? হ'ল কি? বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—এই রকম পোষাক পরে' সঙ সেজে আপনার কাছে আস্‌তে আমার কষ্ট হচ্চে। তখনি হ্যালিডে সাহেব বলেছিলেন—আপনি আপনার পোষাকেই আস্‌বেন—আমার খুসির দিকে চেয়ে আপনাকে পোষাক বদ্‌লাতে হবে না। এর পর বিদ্যাসাগর আর কখখনো তাঁর সেই সনাতন পোষাক ত্যাগ করেন নি।

(১০)

বিদ্যাসাগর বল্‌তেন—ছেলেদের লেখাপড়া নির্ভর করে তাদের পিতা, মাতা আর ঘরে-পড়ার ওপর : সেদিকে বাবাকেও দৃষ্টি রাখতে হবে—মারও দেখাশুনা করা চাই ; বাড়ীতে যাতে ছেলেদের পড়া-শুনা ভালো হয়—তাও দেখ্‌তে হবে—আর তাঁদের দেখ্‌বার সময় না হ'লে শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে। কয়েকজন বন্ধু মিলে একবার এই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, এমন সময়ে একজন বলে' উঠ্‌লেন—আজকাল জেনারেল এসেম্‌বিলীতে বেশ ভালো পড়াশুনা হচ্ছে। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—না, তা নয়। অপর ব্যক্তি বল্‌লেন—কেন এ-কথা বল্‌ছেন? বিদ্যাসাগর হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলেন—"আমি যখন স্কুল দেখে বেড়াতাম, তখন মেদিনীপুর জেলায় দেখেছিলাম—এক জায়গায় নদী পার হওয়ার ব্যবস্থাটা ভারি সুন্দর। একখানা ডোঙা নৌকো একটা নগিতে বাঁধা থাকে। ঘাটে পারাণী-পয়সা পাট্‌নীকে দিয়ে নৌকোয় ওঠো—নগিটা তোল—নিজে দু-চার ধাক্কা দাও—পর-পারে পৌঁছোও। তা'র পরে চলে' যাও আপনার পথে—নৌকোখানা নগিতে আট্‌কে রেখে। আমাদের দেশে যে-সব কলেজ আছে তাদের সবেতেই ঐ রকম ব্যবস্থা। পয়সা ফেল—নিজে নগি ঠেলো—পার হ'য়ে চলে' যাও। ছেলেদের পড়বার দিকে বাপ-মায়ের দৃষ্টি থাকা চাই—আর বাড়ীতে তাদের পড়াশুনা যাতে হয় তার উপায় করা চাই ; তা না হ'লে তাদের পড়াশুনা হবে না। এই হয়েছে এখনকার নিয়ম !"

(১১)

আর একবার বন্ধুদের সংগে বিদ্যাসাগরের আলোচনা হচ্ছিল— আজকাল কলেজ আর স্কুল হ'তে যে-সব ছেলে পরীক্ষায় পাস্ করে' বেরুচ্চে, তা'রা লেখাপড়া কেমন শিখেছে আর তা'তে লাভ-ক্ষতি কি-রকম হচ্ছে! বিদ্যাসাগর ঠাট্টা করে' মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বলেছিলেন—দেশে শিক্ষার বিস্তার কিছুই হয় নি। কেমন হয়েছে জানো! একবার শুনেছিলাম, বিলাত থেকে একটা কল এসেছে—তা'তে একদিকে একটা দুধোলো গাই, আর একদিকে কতকগুলো আখ ঢুকিয়ে দিতে হয়। কলের ভিতরে ঢুকে গাইটি দুধ দেয়—আখগুলো হ'তে রস বেরোয়, আর সেই রস হ'তে হয় ক্রমে ক্রমে গুড় আর চিনি। দুধ হ'তে হয়—ছানা। ঐ ছানা আর চিনির পাকে হয় সন্দেশ। সেই সন্দেশ আলাদা রঙ্ ও ছাপে তৈরি হচ্ছে আম, আতা, গোলাপফুল—কত কি! চেখে দেখ সবেতেই সেই সন্দেশেরই স্বাদ! আকারে ও রঙেই তফাৎ। আজকালকার কলেজের পড়ার ভিয়ান সেই একপাকে তৈরি মাল—কোনোটা এম, এ, কোনোটা বি, এ, কোনোটা এল, এ, কোনোটায় বা এণ্ট্রেন্সের ছাপ। সবারই শিক্ষা এক। কলেজে বা স্কুলে শিক্ষার বিশেষ কিছু হচ্ছে না বুঝে বিদ্যাসাগর অনেক সময়ে খুবই দুঃখ করতেন।

(১২)

বিদ্যাসাগরের তখন অনেকগুলি স্কুলের বই বেরিয়েছে। ভালো বই বেছে নিয়ে সেই বই স্কুলে পড়াবার জন্যে সেণ্ট্রাল

টেক্স্ট বুক কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর এট্‌কিন্‌সন্ সাহেব বিদ্যাসাগরকে সেই কমিটির সভ্য হবার জন্যে তাঁর সম্মতি চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তার জবাব কি দিয়েছিলেন, জানো? দুটি কারণ দেখিয়ে বিদ্যাসাগর এট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের অনুরোধ রাখতে পারেন নি। তিনি জবাবে বলেছিলেন—

(১) কমিটিতে অনেক বই আস্‌বে—আমারো বই আস্‌বে। তাই বই পরীক্ষার বিচারক হওয়া আমার উচিত হবে না।

(২) তিনি মনে করেন, কমিটির সভ্যরূপে আমি সেখানে উপস্থিত থাক্‌লে হয়তো আমার বইগুলির সম্বন্ধে অন্যে ঠিকমতো মত প্রকাশ করতে পারবে না।

কাজেই, আমি ঐ কমিটির সভ্যপদ পাবার উপযুক্ত বলে' আমাকে মনে করি না। দেখতো কেমন সোজা জবাব! কত নির্লোভ পুরুষ ছিলেন, তিনি।

(১৩)

কবি নবীনচন্দ্র সেন ১৮৬৫ সালে এফ্. এ, পাশ করার পর তাঁর বাবা খরচ বন্ধ করে' দেন। তিনি ছেলে পড়িয়ে বি. এ., পড়ছিলেন। এই সময়ে তিনি একটু কষ্টে পড়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর অবস্থা বিদ্যাসাগরকে জানাবার জন্যে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। বাড়ীতে যেয়ে শুন্‌লেন—বিদ্যাসাগর বাড়ীতে নেই—গেছেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাড়ী, বিশেষ কাজে। বিদ্যাসাগরের সংগে তাঁর দেখা করা চাই-ই। গেলেন রাজনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে। দেখ্‌লেন বিদ্যাসাগর রাজনারায়ণ বাবুর সংগে

কি একটা বিষয়ের আলোচনা করছেন। আলোচনা কখন্ শেষ হবে তারই প্রতীক্ষা করছিলেন—নবীন বাবু। একটু পরেই তাঁদের আলোচনা শেষ হ'ল। তখন নবীন বাবু ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বিদ্যাসাগরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। দুঃখে তাঁর প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল। প্রণাম করার সময় দুঃখের অশ্রুজল পড়েছিল বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পবিত্র চরণে। তিনি নবীনচন্দ্রকে হাত ধরে' তুলে মিষ্টিস্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি বাবা, কি হয়েছে তোমার। নবীনচন্দ্র বিশেষ কিছু বল্‌তে পারছিলেন না তখন। বিদ্যাসাগর ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বল্‌লেন—কি হয়েছে বাবা, বল না! নবীনচন্দ্র তাঁর অভাব জানালেন।· শুনেই বিদ্যাসাগর এক খানা কাগজে কি লিখে তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌লেন—যাও কলেজে। কেরানীকে দাও গে।··· নবীনচন্দ্র গিয়ে কেরানীকে চিঠি দিলেন। কেরানী ড্রয়ার থেকে ৪০৲ চল্লিশ টাকা বের করে' ছেলেটির হাতে দিয়েছিলেন। সেই টাকায় নবীনচন্দ্রের যথেষ্ট উপকার হয়েছিল। এর পরে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ হয়েছিলেন।*

'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যপুস্তকের উপহার পৃষ্ঠায় নবীনচন্দ্র লিখেছিলেন—"যে যুবক দুঃখের সময়ে অশ্রুজলে একদিন আপনার শ্রীচরণ অভিষিক্ত করিয়াছিল, আজি সেই যুবক আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইল।······আপনার আশীর্বাদে, ততোধিক আপনার

* বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে মুদ্রিত আনন্দবাজার পত্রিকা—১২ই আশ্বিন, ১৩৬৫।

অনুগ্রহে, আজ তাহার বদন প্রসন্ন—হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ।...
আমার হৃদয়—কানন। আমার উপহার—বনফুল।...”

(১৪).

একদিন সকালে বিদ্যাসাগর তাঁর বাড়ীর উপরতলায় বারান্দায় পায়চারী করছেন। গেটের কাছে দেখ্লেন, গোয়ালা তাঁর বাড়ীতে দুধ দেবার জন্যে গাই-বাছুর এনেছে। গেটের চৌকীদার এসে দাঁড়িয়েছে—গোয়ালার দুধ-দোওয়ায় পাহারা দেবার জন্যে—জল মিশিয়ে দেয় কি-না দেখ্তে। গোয়ালা বাছুর টাকে ছেড়ে দিল। বাছুর তার মায়ের দুধ খেতে লাগ্লো। গাইয়ের দুধ পানালে গোয়ালা বাছুরটিকে বেঁধে দিল—তার মায়ের পায়ে। গোয়ালা গাই দুইছে—বাছুরটি মায়ের দুধ খাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে। এই দৃশ্য দেখেই বিদ্যাসাগরের প্রাণে জেগে উঠ্লো করুণার ভোগবতী। মায়ের দুধ বাছুরে খেতে পাবে না—খাবে অপরে। এক প্রাণীকে বঞ্চনা করে' অন্যে তার দেহ পুষ্ট করবে! এ তো ভগবানের রাজ্যে কম অত্যাচার নয়। সেই দিনেই তিনি দুধ খাওয়া ছেড়ে দিলেন। হাজার চেষ্টা করে'ও কেউ তাঁকে দুধ খাওয়াতে পারে নি। কিছু দিনের পর তিনি খুবই অসুখে পড়েছিলেন। শরীরে তাঁর বল কমে' গেছে—উঠ্তে বস্‌তেও কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন—দুধ খেতে। ডাক্তারের কথাও তিনি শোনেন নি। কন্যা হেমলতা অনেক দিন পরে অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে ‘ভীষ্মের পণ’ ভেঙে ছিলেন! শুন্‌লে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা!

(১৫)

মেট্রপলিটান স্কুল খুলেছেন—বিদ্যাসাগর। পৌষ-পার্বণ এসেছে। কিন্তু পৌষ-পার্বণের ছুটি নেই। ছেলেরা ছুটি চাইলে বিদ্যাসাগর তাদের তাড়িয়ে দিলেন—ধ'ম্‌কে। ছেলের দল পরদিন সকলে মিলে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে পৌঁছেছে—পৌষ-পার্বণের ছুটি তাদের চাই-ই। বল্‌লে তা'রা ছুটি আমাদের দিতেই হবে। বিদ্যাসাগর ছুটি কিছুতেই দেবেন না। আড়াল থেকে একটি ছেলে বলে' উঠ্‌লো—উনি তো মায়ের হাতের পিঠে খাবেন! আমাদের বুঝি মা নেই—পিঠে গড়ে' মা যে চোখের জল ফেল্‌বেন—আমাদের কাছে না পেয়ে! কথাটা তাঁর কানে গেল। শুনেই তিনি বল্‌লেন—কে বল্‌ছিস্‌রে—মায়ের কান্নার কথাটা! কেউই স্বীকার করে না। বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—তোরা ঠিকই বলেছিস্—ছেলের জন্যে মায়ের প্রাণ কাঁদবেই, এবারের মতো একটা কাজ কর—আমার মা নিজের হাতে ।পঠে গড়ে' দাঁড়িয়ে থেকে তোদের খাওয়াবেন—তোরা পৌষ-পার্বণটা এবারে আমার বাড়ীতেই করিস্। শুনেই তাদের আনন্দ দেখে কে! ছেলের পাল হুল্লোড় করে' বেরিয়ে যাচ্ছে,—বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—স্কুলে যেয়ে আর গোলমাল করিস্ নি। কারুকে নিমন্ত্রণ করতে হ'লে তাঁর বাড়ীতে যেয়ে নিমন্ত্রণটা করে' আস্‌তে হয়। তোদের বাড়ী তো এখন আমার স্কুলেই। আমি দুপুরে যাবো তোদের স্কুলে। নিমন্ত্রণ করে' আস্‌বো—তোদের সকলকে,

আর তার সংগে তোদের শিক্ষকদেরও। এক-যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন? কি বলিস্ তোরা?

কি আর বল্‌বে তা'রা! ছুটে বেরিয়ে গেল তা'রা বিদ্যাসাগরের বাড়ী হ'তে। এই দৃশ্য দেখে বিদ্যাসাগর বাড়ীর ভিতর গিয়ে মাকে বল্‌লেন—মা, কাল তোমার বাড়ীতে পায়েস-পিঠে খাবে—প্রায় ৭০০ সাত-শ ছেলে আর শিক্ষক! মা শুনেই ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করলেন। সব কথা ছেলের মুখে শুনে মা হেসে বল্‌লেন—কিন্তু বাবা, সাত-শ ছেলের আর শিক্ষকের পায়েস-পিঠে তৈরি করাও তো সহজ কথা নয়। এতো সব জিনিষ যোগাড়ই বা কি করে' হবে—আর করবেই বা কে! বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—সে জন্যে ভেবো না মা, তোমার কি কি জিনিষ চাই, আর পিঠে গড়্‌তেই বা কজন মেয়ে মানুষ চাই, আমায় বলো। জিনিষ-পত্র আজ সন্ধ্যের মধ্যেই পেয়ে যাবে আর পিঠে গড়্‌বেন যাঁরা তাঁরা ভোর বেলাতেই এসে যাবেন।

হ'লও তাই। তিনি তখ্‌খনি বেরিয়ে পড়্‌লেন—বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী। তাঁকে সব কথাই বল্‌লেন। পিঠে গড়বার লোক ঠিক করে' দেবেন তিনি। নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিদ্যাসাগর গেলেন বাজারে। চাল গুঁড়ির অর্ডার দেবার জন্যে গেলেন এক জায়গায়। সেখানে অর্ডারটা দিয়ে কিছু টাকা বায়না দিয়ে চলে' গেলেন—অন্যান্য জিনিষের ব্যবস্থা করবার জন্যে। দুধ, চিনি, ময়দা-ঘি—সবেরই ব্যবস্থা করে' এলেন বেলা ১২টার পরেই। এসে স্নানাহার সেরে চল্‌লেন—মেট্রপলিটান স্কুলে।

অন্যান্য ছেলেরা—শিক্ষকেরা খবর পেয়েছে—বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতের পিঠে-পায়েস খাবার নিমন্ত্রণের কথা। বিদ্যাসাগর আর ক্লাসে ক্লাসে না গিয়ে প্রত্যেক ক্লাসের 'মনিটার'কে ডেকে পাঠালেন। তা'রা এলে তাদের ক্লাসের সব ছেলের নিমন্ত্রণের কথা বল্‌তে বলে দিলেন। মাষ্টারদের তিনি নিজে বলে' বেরিয়ে গেলেন—স্কুল হ'তে।

যথাসময়ে ছেলেরা উপস্থিত হয়েছে–শিক্ষকরাও। জায়গাও হ'ল। মা ভগবতী নিজে থালায় করে' পিঠে এনে পাতায় পাতায় পরিবেষণ করে' দিলেন। বামুন ঠাকুর পরিবেষণ করলো হাতা হাতা পায়েস। সেগুলি শেষ হ'তেই এলো লুচি, ডাল, আর তা'র সংগে আবার পায়েস--সন্দেশ–রসগোল্লা! শুন্‌লে, বিদ্যাসাগরের বাড়ীর পিঠে-পায়েসের নিমন্ত্রণের কথা। শোনা যায়—তার পরের বছর হ'তে স্কুলে পৌষ-পার্বণের ছুটি তিনি মঞ্জুর করেছিলেন। এখনো সে-নিয়ম আছে কিনা, আমার জানা নেই।

(১৬)

বিদ্যাসাগরের তখন খুব নাম-ডাক। চারদিকেই শোনা যায়—বিদ্যাসাগর—বিদ্যাসাগর! এই সময়ে একবার তিনি গেছেন—হুগলী জেলার এক গ্রামে স্কুল দেখ্‌তে। গ্রামের অনেকে বিদ্যাসাগরকে দেখ্‌বার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে—কেউ গাছ-তলায়, কেউ-বা ঘরের ছাদে, কেউ-বা পথের একপাশে। হঠাৎ খবর

হ'ল—বিন্যাসাগর আসছেন। ।বদ্যাসাগর এলেন—সেই জনতার সামনে দিয়ে চলেও গেলেন। পুরুষদের অনেকেই দেখেছিলেন—বিদ্যাসাগরকে; কিন্তু মেয়েদের অনেকে চিনতে পারেন নি। তাঁরা মনে করতেন বিদ্যাসাগর হবেন বোধ হয় সেকালের সাহেব-সুবোদের মতো হ্যাট্-কোট্, পরা লম্বা-চওড়া পুরুষ। কিন্তু তাঁর তো হ্যাট্ও নেই—কোট্ও নেই। পরণে সাদা ধুতি—গায়ে মোটা চাদর—পায়ে মুখ-বাঁকা তালতলার চটি। হাজার লোক চলে' যাচ্ছে—কত রকম পোষাকে। কাজেই, তা'রা চিনবে কেমন করে'! এক আধ বয়সী বিধবা তখন জিগ্‌গেস করলেন—হ্যাঁ গা, বিদ্দেসাগর কি আসেন নি? একজন লোক তাঁকে দেখিয়ে বল্‌লেন—এই যে, ইনিই তো বিদ্যাসাগর। প্রবীণার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। একটু তাঁর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—আ আমার পোড়া কপাল? মুখ সিঁটকে বল্‌লেন—এ আবার কি বিদ্যাসাগর। এর যে গাড়ীও নেই…ঘড়িও নেই—চোগা-চাপকানও নেই। বিদ্দেসাগরের এ কী উড়ে-ম্যাড়ার মতো চেহারা।

(১৭)

তোমাদিগকে কয়েকবারই বলেছি—অনাথ-আতুর দেখ্‌লে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠ্‌তো। একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন,…একজন লোকের মুখে শুন্‌লেন—একটু আগে একটি লোক পড়ে' আছে—তা'র কলেরা হয়েছে। সেই লোকটি যাঁর বাড়ীতে কাজ করতো তা'র কলেরা হওয়ায় পাছে তাঁদের বাড়ীতে কারো ঐ রোগ ধরে, আশংকা করে' তিনি তাকে রাস্তায়

শুইয়ে দিয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগর তাড়াতাড়ি সেই রোগীর কাছে পৌঁছলেন। সে তখনো বেঁচে আছে—জ্ঞানও বেশ আছে। তিনি করলেন কি জানো? একটা গাড়ী ডেকে লোকটিকে নিজে তুলে নিয়ে গাড়ীতে চড়িয়ে দিলেন। আর তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে' নিজের বিছানায় শুইয়ে ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠালেন। তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় আর সুচিকিৎসায় লোকটি বেঁচে উঠ্‌লো। এত দয়া তাঁর!

(১৮)

বিদ্যাসাগর ছোটলোক বড়লোক বিচার করতেন না। গরীব বলে' তাকে ঘৃণা, আর বড়লোক বলে' তাকে আদর—এ তাঁর কাছে ছিল না। একদিন তিনি যাচ্ছেন—একটা পথ দিয়ে। রাস্তায় দেখ্‌লেন তাঁর চেনা এক মুদীর দোকান। মুদী বিদ্যাসাগরকে দেখেই দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্যাসাগরকে 'খুড়ো' বলে' ডেকে বল্‌লেন—খুড়ো এই তো আমার দোকান··· আমার দোকানে পায়ের ধূলো দিতেই হবে। আদর করে' নিয়ে যেয়ে বসালো মুদী তা'র খুড়োকে (বিদ্যাসাগরকে) দোকানের সাম্‌নের জায়গায় একটা চট পেতে। খুড়োকে সেজে এনে দিল তামাক। বিদ্যাসাগরের আনন্দ দেখে কে? তামাক খেতে যে তিনি খুব ভালবাসতেন। তামাক খাচ্চেন আর খুড়ো-মুদীর সাথে গল্প করছেন। এমন সময়ে তাঁর এক ধনী বন্ধু ঐ রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলেন—জুড়ি গাড়ী চড়ে'। দেখ্‌লেন তিনি বিদ্যাসাগরকে এই অবস্থায়। এড়িয়ে যেতে পারলেন না—ধনী বন্ধুটি। তাঁকে

জুড়ি হ'তে নাম্‌তেই হ'ল। দুটো একটা কথা ক'য়ে চড়্‌লেন তিনি তাঁর গাড়ীতে।

কয়েকদিন পরে বিদ্যাসাগর গেছেন তাঁর ঐ ধনী বন্ধুর বাড়ীতে। তিনি বিদ্যাসাগরকে দেখেই বলেছিলেন—আপনি পথে-ঘাটে যার-তার বাড়ীতে ঐ রকম করে' বসে' থাকেন—আপনার হয়তো লজ্জা হয় না—কিন্তু আমরা তাতে লজ্জা বোধ করি। আপ্‌নার মতো লোকের কি মুদী-চাষার সাথে এক জায়গায় বসে' তামাক খাওয়া সাজে! তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—যদি এতে আপনার লজ্জা বোধ হয়, তাহ'লে আমার সংগে আপনার পরিচয় না রাখাই ভালো···তাহ'লে আর আপনাকে এ-রকম লজ্জা পেতে হবে না। আমি কিন্তু গরীব, বড়মানুষ, সবাইকে এক রকমই দেখি!

(১৯)

এই ঘটনার পর একদিন বিদ্যাসাগর ঐ ধনী ব্যক্তিটির বাড়ীর দোতলায় বসে আছেন, এমন সময়ে একটি ভিখারী এসে কিছু ভিক্ষের জন্য চীৎকার করতে লাগ্‌লো। ভিক্ষে না পেয়ে ভিখারীর চীৎকার আর থামে না। বিদ্যাসাগর একটু বিরক্ত হ'য়ে ঐ বন্ধুটিকে বল্‌লেন—একটি ভিখারী যে ভিক্ষার জন্যে এতক্ষণ চেঁচাচ্ছে, তা কি শুন্‌তে পাচ্চেন না? বিদ্যাসাগর বিরক্ত হয়েছেন মনে করে' ঐ ধনী বন্ধুটি ভিখারীকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে বল্‌লেন। তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল ভিখারীকে। বিদ্যাসাগর সব দেখ্‌লেন। দেখেই তিনি উঠ্‌লেন সেখান থেকে। শুধু বল্‌লেন একটু বিশেষ

কাজ আছে—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আস্‌চি ! এই বলেই বেরিয়ে গেলেন তিনি সেখান থেকে। ভিখারী আগে চলেছে—তিনিও তা'র পেছন ধরলেন। কাছে পৌঁছেই তিনি ভিখারীকে একটি টাকা দেখিয়ে বল্‌লেন—এতক্ষণ ও-বাড়ীতে ভিক্ষের জন্যে খুবই চেঁচামেচি করছিলে, কিছু তো পেলে না। এখন যদি তুমি স্বীকার করো, ও-বাড়ীতে ভিক্ষের জন্যে আর কখনো যাবে না, তাহ'লে আমি এখ্‌খনি এই টাকাটি তোমাকে দিতে পারি। ভিখারী রাজি হ'ল। বিদ্যাসাগর টাকাটি ভিখারীর হাতে দিয়ে আবার সেই ধনী বন্ধুর বাড়ীর দোতলায় এসে তাঁর কাছে বস্‌লেন —আর দরকার মতো কথাবার্তা সেরে বাড়ী ফিরে এলেন। তারপর বিদ্যাসাগর আর কখনো সেই ধনী বন্ধুটির বাড়ী যান নি। তিনি সেদিন যেন শুনেছিলেন—ভিখারীরূপী দেবতার সেই বাণী—"অন্নহীনে অন্ন দিলে আমি থাকি ঘরে।" দুঃখের সংগে বল্‌তে হচ্চে—সেই ধনী ব্যক্তির সংসারে সেই দিন হ'তেই ভাঙন ধরেছিল।

(২০)

বিদ্যাসাগর যখন স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর, তখন তিনি পাল্‌কি চড়েই এক স্কুল থেকে আর এক স্কুলে যেতেন। বেহারারা এক জায়গায় পাল্‌কি নামিয়ে একটু বিশ্রাম করছে। তিনি পাল্‌কির ভিতর বসে' কি একখানা বই পড়্‌ছিলেন। এমন সময়ে একটি ছেলে এসে একটি পয়সা চাইলে। বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—একটি পয়সায় কি করবি রে ? ছেলেটি বল্‌লো— বড় ক্ষিদে পেয়েছে—

মুড়ি কিনে খাবো। বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—যদি দু-পয়সা দি? ছেলেটি বল্‌লো—বড় ক্ষিদে পেয়েছে—দু-পয়সারই মুড়ি কিনে খাবো। —যদি চার পয়সা দি? —দু-পয়সার মুড়ি খাবো; আর দু-পয়সার মুড়ি মায়ের জন্যে কিনে নিয়ে যাবো। দেশে ভিখ্‌ পাওয়া যায় না বাবু, সব্বারই কষ্ট হয়েছে—মাও কাল থেকে পেট ভরে' খেতে পায় নি। শুনেই বিদ্যাসাগরের চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে' এলো। সেই অবস্থায় বল্‌লেন—আচ্ছা যদি দু-আনা দি? ছেলেটি বল্‌লে তা হ'লে বাবু, আমরা মায়ে-বেটায় আপনার কল্যাণে চার পয়সার মুড়ি খেয়ে বাঁচবো—আর চার পয়সার আম কিনে ফেরি করে' বেচ্‌বো···তাতে কিছু লাভ করবোই। লাভের পয়সায় আম কিন্‌বো—আর ঐ রকম ফেরি করে' আমাদের মা-বেটার খাওয়ার খরচটা চালিয়ে নেবো কোনো রকমে। ছেলেটির কথা শুনে বিদ্যাসাগর ছেলেটির হাতে একটি টাকা দিয়ে বলেছিলেন—এই টাকা নিয়ে যদি তোদের মা-বেটার খরচ কোনোরূপে চালাতে পারিস্—ভিক্ষে না করে',—তা হ'লে আমি তোর একটা দোকান করে' দিয়ে যাবো—কিছুদিন পরে। করেছিলেনও তাই।

ছেলেটি খুব মেহনতী ছিল। সে পরিশ্রম করে' সেই দোকান কিছু দিন চালালো—কিছু লাভও হ'ল। সে এবার আর একটি ওষুধের দোকান খুলেছিল। তা'তে তা'র বেশ লাভ হ'তে লাগ্‌লো। কয়েক বছর পরে ছোট্ট একটি পাকা ঘর তৈরি করে' বেশ ভালো করে' সাজিয়ে বিদ্যাসাগরের একখানি oil-

painting—(তৈল-চিত্র) করিয়ে, সে যেখানে বস্‌তো তা'র উপরে টাঙিয়ে রাখ্‌তো—সকাল-সন্ধ্যায় ধূপ-ধূনো দিতো। ভালো ভালো ফুল দিয়ে পূজোও করতো। এমনি করে' কয়েক বছর কেটে গেল।

একদিন বিদ্যাসাগর আবার সেই রাস্তায় যাচ্ছিলেন। ছেলেটি দেখেই চিন্‌লো তাঁকে। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্যাসাগরের সাম্‌নে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালো। অনেক দিনের কথা হ'য়ে গেছে—বিদ্যাসাগর জিগ্‌গেস করলেন, কে তুমি বাবা? ছেলেটি বল্‌লো—সেই সে-বছর দুর্ভিক্ষের বছরে—যার হাতে একটি টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন—আমি সেই গরীবের ছেলে। আপনার দয়াতেই এই দোকান করেছি। আমার দোকানে একবার পায়ের ধূলো দিতেই হবে। বিদ্যাসাগর খুব খুসী হ'য়ে দোকানে গিয়ে একটু বসেও ছিলেন। তারপর ছেলেটির মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে' দোকান হ'তে যেখানে যাবেন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।*

(২১)

বিদ্যাসাগর একবার খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন। বিশ্রাম করবেন তিনি কার্‌মাটারে গিয়ে। তাঁর মাসিক দান ছিল ৮০০৲ আট শত টাকা। তিন মাস তিনি কার্‌মাটারে থাকবেন। তিন মাসের জন্য ২৪০০৲ টাকা, আরো ১০০৲ একশত টাকা

* এই গল্পটি আমি বর্ধমান সহরের ঘটনা বলেই বর্ধমানে শুনেছি। তদনুসারেই এইরূপ লেখা হ'ল।

বেশী ২৫০০৲ টাকা দিয়ে গেলেন এক বন্ধুর হাতে। মাসিক সাহায্য যাঁরা পান তাঁদের নাম ও সাহায্য যত টাকা পান তা'র হিসাব যে-খাতায় লিখে রাখতেন সে খাতা খানাও দিয়ে গেলেন তিনি তাঁর বন্ধুর হাতে। এক মাস কেটে গেল। খবর আসতে লাগ্‌লো—যা'রা সাহায্য পায় তাদের কাছ হ'তে—আমরা সাহায্যের টাকা পাই নি—পেটে ভাত নেই—উনুনে হাঁড়ি চড়ছে না। খবর পেয়েই তিনি বন্ধুকে চিঠি দিলেন—কিন্তু জবাব মিললো না। অগত্যা তাঁকে সেই অসুস্থ শরীরেই কল্‌কাতায় ফিরতে হ'ল। জিগ্‌গেস্ করলেন বন্ধুকে—যা'রা মাসোহারা পায়, তারা টাকা পায় নি কেন? বন্ধুবর আম্‌তা আম্‌তা করে' জবাব দিলেন—হাতে অন্য কাজ ছিল—তাই দিতে পারি নি। বিদ্যাসাগর তখন তাঁকে বলেছিলেন—তা বেশ করেছ—এখন টাকাটা দাও—আমি এদের টাকা দিয়ে যাই। এই কথা শুনেই বন্ধুটি সেখান থেকে চলে' যাবার সুবিধা খুঁজ্‌ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সতর্ক দৃষ্টিতে তিনি জবাব না দিয়ে যেতে পারলেন না। অনেক কষ্টে বল্‌লেন—সে টাকা তো নেই—একটা কাজে খরচ হ'য়ে গেছে—বলে'ই তিনি দিলেন গা-ঢাকা। বিদ্যাসাগর তখ্‌খনি ২৫০০৲ টাকা ধার করে' এনে যার যা পাওনা দিয়ে দিলেন। এই রকম করে' কত লোক তাঁকে যে ঠকিয়েছে তা আর বলা যায় না। পরে এই রকম ঠকানোর কথা আবার কিছু বল্‌বো।

———

বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবন

তোমরা শুনেছ ১৫ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। ৩৯ বছর বয়সে একটি ছেলে হ'ল তাঁর। ছেলেটির নাম রাখা হয়েছিল—নারায়ণচন্দ্র। নারায়ণের ওষুধ দেওয়ায় ছেলেটি হয়েছিল বলে' ছেলের নাম রাখা হয়েছিল—নারায়ণ। এ-ছাড়া তাঁর আর চারটি মেয়ে হয়। তাঁদের নাম—হেমলতা, কুমুদিনী, বিনোদিনী আর শরৎকুমারী। পিতামাতার উপর ভক্তির কথা পূর্ব্বে তোমরা কিছু কিছু পড়েছ। তাঁদিকে সুখী করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। তাঁদের সেবার জন্যে যত কষ্টস্বীকার করা হোক, তিনি আনন্দের সংগে তা করতেন। নিজের সুখ-শান্তির দিকে তাঁর নজর ছিল না।

তোমরা পড়েছ, চাকরীতে ঢুকেই তিনি বাবাকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়েছিলেন—চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে। চাকরী ছাড়ায় ঠাকুরদাসের ইচ্ছে না থাক্‌লেও তাঁকে ছাড়্‌তে হয়েছিল—ছেলের জেদে। ঠাকুরদাস বাড়ীতে বসে' ঘরের কাজ দেখ্‌তেন, আর তার সংগে পাড়া-প্রতিবেশীদেরও কাজে তিনি আপনাকে লাগিয়ে ছিলেন। মা ভগবতী দেবী ছিলেন—পাকা গিন্নী। তিনি বাড়ীর সকলের, আত্মীয় প্রতিবেশীদের সেবা-শুশ্রূষায় সর্বদাই রত থাক্‌তেন। এজন্যে যত টাকা খরচ হোক বিদ্যাসাগর তা পাঠিয়ে

দিতেন। যত দিন তাঁর পিতামাতা বেঁচে ছিলেন তত দিন তিনি তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কল্‌কাতার বাসায় নিয়ে যান নি। বিশেষ দরকারে মাঝে মাঝে দু-চার দিনের জন্যে তাঁরা যেতেন মাত্র।

বিদ্যাসাগর বাড়ীতে গেলে বাড়ীর লোকের আনন্দের চেয়ে দেশের লোকেরই বেশী আনন্দ হ'ত। কারো কোনো-কিছুর অভাব তিনি দেখ্‌তে পারতেন না। যত টাকাই খরচ হোক, তা'র দিকে তাঁর নজর ছিল না। এই জন্যে গ্রামের আর গ্রামের আশ-পাশের লোকেরা মনে করত বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে অনেক টাকা আছে। তাই কতকগুলো দুষ্টু লোক টাকার আশায় তাঁর বাড়ীতে ডাকাতি করেছিল। এর কথা তোমাদের আগেই বলেছি।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামাতা দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। তাঁরা দুজনে প্রায় একই প্রকৃতির লোক ছিলেন। অন্যের দুঃখ-কষ্ট তাঁরা উভয়েই সহ্য করতে পারতেন না। ভগবতী দেবীর অসাধারণ গুণ। তিনি মেহনত করতে পারতেন খুব। যখনই দরকার পড়্‌তো তখনই তিনি অন্যের কাজ করবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌তেন। বিদ্যাসাগরও এই সব গুণ পেয়েছিলেন, তাঁর মায়ের কাছ হ'তে। তাঁর হৃদয় কত উদার ছিল সে-সম্বন্ধে একটি গল্প বলি শোন ঃ—

কল্‌কাতায় এখন হ্যারিসন রোড বলে' যে রাস্তাটির নাম, সেটি ইন্‌কাম্‌ট্যাক্সের বড় সাহেব হ্যারিসন সাহেবের নামেই হয়েছে। তিনি ঐ কাজেই একবার মেদিনীপুর জেলায় গিয়েছিলেন।



পত্নী—দীনময়ী দেবী—১২৪ পৃঃ

বিদ্যাসাগরের তখন খুব নাম-ডাক ; ছোট লাট, বড় লাট, সকলের সংগেই তাঁর ভালোবাসার সম্বন্ধ। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম তাঁর বাসস্থান জেনে তিনি একবার ঐ বীরসিংহ অঞ্চলে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তখন ছিলেন—বীরসিংহে। তাঁর সংগে বিদ্যাসাগরের খুবই জানা-শোনা ছিল। বিদ্যাসাগর মাকে বল্‌লেন—মা, এক বড় সাহেব এসেছেন, তাঁর সংগে আমার ভালো করে'ই জানা-শোনা আছে। আর জানো কি, সাহেব পরিষ্কার বাংলা কথাও বল্‌তে পারেন। ছেলের বন্ধু আর বাংলা কথা বল্‌তে পারেন সাহেব, জেনে বল্‌লেন—তা হ'লে ঈশ্বর, সাহেবকে একদিন খাবার নেমন্তন্ন করে' আয় না! আহা ছেলেটিকে দেখ্‌বো। বাছা দেশ থেকে কত দূরে এসে পড়েছে—চাকরী নিয়ে। মা-বাপের কি অবস্থা হচ্ছে, বল্ দেখি, বাবা! মার কথা শুনে ঈশ্বরচন্দ্র সাহেবের সংগে দেখা করে' মা যা বলেছেন, সেই কথা জানালেন। সাহেব বল্‌লেন—আপনার বাড়ী যেতে পারি, মা যদি আমাকে নিজে এসে নেমন্তন্ন করেন। মায়ের নিজে আসা হ'ল না। তিনি নিজের হাতে সাহেবকে এক খানা চিঠি লিখে পাঠালেন। চিঠি পেয়ে সাহেব কত খুসী! এলেন ঠিক সময়ে। মা ভগবতী দেবী নিজের হাতে নানারকম খাবার তৈরি করে' আসন পেতে সাহেবকে খাবার দিলেন, আর তিনি সেই খানে বসে' যেটির পর যেটি খেতে হবে, দেখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। হ্যারিসন সাহেব এতে যে কত খুসী হয়েছিলেন, তা আর তোমাদিগকে কি বল্‌বো। তিনি বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—আপনার বাড়ীতে এসে আপনার

আতিথ্যে আর আপনার মায়ের আদর-যত্নে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি, এটি আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে।

তার পর বল্‌লেন— মা, শুনেছি আপনার অনেক টাকা আছে। কত টাকা আপনার আছে, বলুন তো ?

ভগবতী দেবী বলেছিলেন—আমার চার ঘড়া ধন আছে। এই বলে' তিনি দেখিয়ে দিলেন তাঁর তিন পুত্র ঈশ্বর, দীনবন্ধু, শম্ভুকে—আর চতুর্থ ঘড়া ধন দেখিয়ে দিলেন সাহেবের দিকে আঙুল বাড়িয়ে। উত্তর শুনে সাহেব বিদ্যাসাগরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—"এমন মা না হ'লে কি এমন ছেলে হয় ?"—শচী মায়ের শক্তি পেয়েই তো নদীয়ার দামাল ছেলে গোরা মহাপ্রভু হ'তে পেরেছিলেন !

পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে বিদ্যাসাগর প্রায়ই যেতেন। একবার ঐ রাজবাড়ীতে হডসন নামে একজন ফোটোগ্রাফার এসেছিলেন। তিনি রাজবাড়ীর অনেকের ভালো ভালো ছবি তুলেছিলেন। তাই দেখে বিদ্যাসাগরেরও ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর বাবার ও মায়ের দুখানি ফোটো ছবি তুলিয়ে নেবেন। এই জন্যে তিনি বাবা আর মাকে কল্‌কাতায় নিয়ে এলেন—বীরসিংহের বাড়ী হ'তে। মাকে বল্‌লেন, মা, পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে একজন খুব ভালো ছবি তোল্‌বার লোক এসেছে। আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে তা'র দ্বারা বাবার ও তোমার দুখানি ছবি তুলিয়ে রাখি। সব শুনে অল্পেই ঠাকুরদাস রাজি হলেন। কিন্তু মা বল্‌লেন—দূর, আমার ছবি তুলিয়ে কি করবি ? ছি, ছি—কি

ঘেন্নার কথা! বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—মা গো, ছবি তো তোমার জন্যে নয়। ছবি আমার জন্যে। আমি থাকি কল্‌কাতায়—কখনো কখনো বাইরেও যেতে হয়! তখন তোমার জন্যে আমার মন কেমন করে' উঠ্‌লে ছবিখানি দেখেও মনে করতে পারি যেন আমি তোমার কাছেই আছি। শুনে মা আর 'না' বল্‌তে পারলেন না। বিদ্যাসাগর জানতে চাইলেন,—বলো তো মা, সাহেবকে এখানে নিয়ে আস্‌বো, না তুমি পাকপাড়ার রাজবাড়ীতেই যাবে? শুনেই মা বল্‌লেন—না বাবা, রাজবাড়ীতে যেতে পারবো না—সাহেবকে এই খানেই নিয়ে আসিস্। বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—মা, রাজবাড়ীতে ছবি তোল্‌বার জায়গা ঠিক করাই আছে। সেটা এখানে তুলে এনে বসিয়ে ছবি তুল্‌তে গেলে ছবি ভালো হবে না। তাই বল্‌ছি—রাজবাড়ীতে যেতে আর আপত্তি কোরো না। শুনেই মা বলেছিলেন—তোকে তো এঁটে উঠ্‌তে পারবো না—তুই যা ধরবি তাই করবিই—জানি তোর যে শুওরে গোঁ! তবে এটাও বলে' রাখি—ছবি তোল্‌বার সময় মুখ খুলে সাহেবের সাম্‌নে আমি বস্‌তে পারবো না! বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—তা হ'লে ছবি হবে কি করে'? মুখ ঢাকাই যদি রইলো, তা হ'লে তোমার কাপড়-ঢাকা একটা জড়ের ছবি তুলিয়ে, আমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে কি করে'? বিদেশে তোমাকে দেখ্‌বো—দেখে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে কি করে'? যাই হোক আমার সংগে তোমাকে যেতেই হবে—এতে যদি কেউ কিছু বলে, সে তো তোমাকে বল্‌বে না—আমাকেই তা বল্‌বে। এই কথা

শুনে মা আর অন্যমত করতে পারেন নি। এই বইয়ে যে তিনখানি ছবি—একখানি বিদ্যাসাগরের—আর একখানি—পিতা ঠাকুরদাসের আর একখানি মা ভগবতী দেবীর এই তিনখানি ছবি ঐ হডসন্‌ন সাহেবেরি তোলা।

এর পরে ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবী বীরসিংহে ফিরে যান।

এইরূপে কিছু দিন কেটে গেল। বীরসিংহের বাড়ীতে এক দিন ঠাকুরদাস স্বপ্ন দেখ্‌লেন—তাঁদের বাড়ী পুড়ে গেছে—পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক রকম বিপদ ঘট্‌বে—ভাইদের সংগে ঈশ্বরের বনিবনাও হবে না—বন্ধু-বিচ্ছেদও ঘট্‌বে। স্বপ্ন দেখ্‌বার পর তিনি সব ছেড়ে কাশীবাস করবার ইচ্ছে করলেন। বিদ্যাসাগরের কাছে খবর পাঠালেন—শম্ভুচন্দ্র। বিদ্যাসাগর ছিলেন তখন কাঁদিতে। খবর পেয়েই নানা রকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাবাকে চিঠি লিখ্‌লেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি কিছু বুঝ্‌লেন না। কাশী তিনি যাবেনই জানিয়ে ছেলেকে খবর দিলেন। বিদ্যাসাগর বাড়ীতে এসে বাবাকে অনেক বুঝলেন—কত অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু ঠাকুরদাসের সংকল্প টল্‌লো না। অগত্যা ঈশ্বরচন্দ্র বাবাকে আর মাকে নিয়ে কল্‌কাতা রওনা হলেন। কিছু দিনের পর কাশীবাসের সব সুবন্দোবস্ত করে বাবাকে আর মাকে নিয়ে কাশী গেলেন।

এই সময়ের একটা গল্প বলি ঃ—বিদ্যাসাগর কাশীতে একদিন বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করতে গেছেন। পাণ্ডারা বিদ্যাসাগরকে

জানে। ঠাকুরের দর্শনী চাইলে অনেক টাকা। বিদ্যাসাগর তত টাকা দর্শনী দিয়ে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন করতে চাইলেন না। পাণ্ডারা বলেছিল, তা হ'লে আপনি কি বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা মানেন না ? তা'র উত্তরে বিদ্যাসাগর বাবার ও মার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেছিলেন—এঁরাই আমার বিশ্বনাথ, আর অন্নপূর্ণা। মা-বাপের উপর বিদ্যাসাগরের ভক্তি কত, বলতো ! মায়ে-পোয়ে তাঁরা ফিরে এলেন কল্‌কাতায়। বাবাকে কাশীতে একলা রেখে এসে বিদ্যাসাগর খুবই মন-মরা হ'য়ে থাক্‌তেন। তাঁর মনের আনন্দ কোথায় যেন উবে গেল।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন—বহু পরিবার এক সংগে থাক্‌লে নানারূপ অসুবিধা হয় এবং অশান্তি জোটে। এই জন্যে তিনি সহোদর ভাইদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বাড়ী তৈরি করে' দিলেন আর তাঁদের খরচ চল্‌বার জন্য মাসিক সাহায্যও দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এত সব ব্যবস্থা করে' দিয়েও সংসারে শান্তি আন্‌তে পারেন নি। তার উপর বাবার-দেখা স্বপ্ন স্বপ্নের একটা কথা সত্যি হ'ল। সে-বছরে চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন রাত দুপুরের সময়ে তাঁদের বীরসিংহের বাড়ীখানা পুড়ে গেল। খবর পৌছলো কল্‌কাতায় ! বিদ্যাসাগর বীরসিংহে এলেন। বাড়ীর সকলকে নিয়ে কলকাতা যাবার ইচ্ছে জানালেন। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে মা ভগবতী দেবী আস্‌তে চাইলেন না। এর কারণ আর কিছু নয়—এতে গরীব ছেলে যারা তাঁদের বাড়ীতে খেয়ে লেখাপড়া শিখ্‌তো তাদের খুবই অসুবিধা হবে—প্রতিবেশীদের

অনেক কষ্ট হবে—অতিথি অভ্যাগত যাঁরা বাড়ীতে আস্‌বেন তাঁদের সেবার ব্যাঘাত হবে ভেবে। এই সময়ে অনেকেই পাকা বাড়ী করতে বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—গরীব ব্রাহ্মণের পাকা বাড়ী সাজে না।

কিছুদিনের পরেই মেজো ভাই দীনবন্ধু কল্‌কাতার সংস্কৃত প্রেসের ও বইয়ের দোকানের ভাগ পাবার জন্যে আদালতে নালিশ করলেন। সেজো ভাই শম্ভুচন্দ্রও লুকিয়ে লুকিয়ে দাদার সংগে ঝগড়া করতে আরম্ভ করে' দিলেন। এই সব ব্যাপারে বিদ্যাসাগর খুবই দুঃখিত হ'য়ে পড়েছিলেন। ভাইদের জন্যে তিনি এত করেছেন—ভাইরা তা বুঝলেন না—মেজো ভাই মিছিমিছি আদালতে নালিশও করলে—এই সব ঘটনায় বিদ্যাসাগর একবারে মর্মাহত হ'য়ে অতি কষ্টে কাল কাটাতে লাগ্‌লেন।

তারপরের ব্যাপার শোন ঃ—দীনবন্ধুর কষ্টের মাত্রাটা খুবই বেড়ে উঠ্‌লো। দাদার সাহায্য তিনি নেবেন না—অবশেষে দাদার সাহায্য নিতেই হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যেই দীনবন্ধুর একটি চাকরী হ'ল। তিনি বরিশালের ডেপুটীর কাজ পেয়েছিলেন। এম্‌নি ছিলেন বিদ্যাসাগর। ভাই তাঁর ওপর মিথ্যে নালিশ করলেন। দাদা সে অপরাধ ভুলে গিয়ে ছোটলাটকে ধরে' ভাইয়ের চাকরী করে' দিলেন। শুধু তাই নয়! বিদ্যাসাগরের কাছে যে কয় মাস তিনি মাসিক সাহায্য নেন নি—রাগ করে', তাও নিতে হয়েছিল। এত দয়া বিদ্যাসাগরের!

কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর শুন্‌লেন ক্ষীরপাই-এর মুচিরাম বন্দোপাধ্যায় এক বিধবাকে বিবাহ করবেন—আর সেই বিয়েটা হবে—বীরসিংহ হ'তে। বীরসিংহে বিধবা বিবাহ হবে—চারদিকে হৈ চৈ' পড়ে গেল। সেখানকার অনেক লোক বিদ্যাসাগরকে তফাতে থাক্‌তে অনুরোধ করায় তিনি থাক্‌বেন না বলে' তাঁদের কাছে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দুটি ভাই—দীনবন্ধু আর শম্ভুচন্দ্রের অশেষ দয়ায় একদিন তাঁদের বাড়ীর কাছেই এক বাড়ীতে ঐ বিবাহ হ'য়ে গেল। লোকে ভাব্‌লো বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় এই বিয়ে হ'য়ে গেছে—বিদ্যাসাগর কথা রাখ্‌তে পারলেন না। নানারকম কুৎসা চারদিকে উঠ্‌লো। বিদ্যাসাগর খুবই অসন্তুষ্ট হ'য়ে—"আর এ গ্রামে আস্‌বো না" বলে' বাড়ী হ'তে বেরিয়ে কল্‌কাতা চলে' এলেন। বিদ্যাসাগর এর পর আর বীরসিংহের বাড়ীতে যান নাই। এমন কঠিনচেতা পুরুষ!

বিদ্যাসাগরের জীবনে নানা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘট্‌তে লাগ্‌লো। পারিবারিক অশান্তি তো আছেই। সমাজের ব্যবহারে তাঁর প্রাণে জাগ্‌লো বিষাদ! তথাপি সব ব্যথা চেপে রেখে অতি কষ্টে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। ভাইরা সব আলাদা হ'য়ে গেছে। শুধু কি তাই? তা'রা তাঁর শত্রুতা করতেও কসুর করছে না। ভেবে, তিনি জীবনটাকে ভার বোধ করতে লাগ্‌লেন। এখন তিনি সংসার হ'তে একরকম আলাদা হ'য়েই থাক্‌তেন।

এই সময়ে খবর এলো, কাশীতে ঠাকুরদাসের ভয়ানক ব্যারাম। বৃদ্ধের সেবা করবার জন্যে গেলেন—দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র—আর ঈশ্বরচন্দ্রের মা ভগবতী দেবী। তাঁরা ঠাকুরদাসের সেবা-যত্ন খুব ভালো করে' করতে লাগ্‌লেন। চিকিৎসাও চল্‌লো। অল্পদিনের মধ্যে ঠাকুরদাস সেরে উঠ্‌লেন। ভগবতী দেবী স্বামীকে বাড়ী ফিরে যেতে অনুরোধ কর্‌লেন। ঠাকুরদাস রাজী হ্‌লেন না বরং ভগবতী দেবীকে তাঁর কাছেই থাক্‌তে বল্‌লেন। ভগবতী দেবী আবার বল্‌লেন—বাড়ী চলো—তোমার মরতে এখনো দেরী আছে। তোমাকে আরও বলে' রাখ্‌ছি, যেখানেই থাকি—মরবার সময়ে আমি তোমার কোলেই মরবো—এই কাশীতেই। এই বলে' কয়েক দিনের পর তিনি কাশী হ'তে অন্য তীর্থে চলে' গেলেন। তীর্থ যাত্রা হ'তে ফিরে চলে' এলেন—ছেলের কাছে। দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্রও কল্‌কাতা ফিরে এলেন।

এইরূপে কিছুদিন কাট্‌লো। তারপর বিদ্যাসাগরের জীবনে এল দুঃখের মেঘ ঘনিয়ে। বড় জামাই গোপালচন্দ্র সমাজপতি এক বছরের মধ্যেই মারা গেলেন! প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন—বড়মেয়ে হেমলতা দেবীকে। তাঁর বিধবার বেশ দেখে পিতার প্রাণে জেগে উঠ্‌তো কান্নার ফোয়ারা। কাঁদতেন, আর চোখ মুছতেন কাপড়ের খুঁটে। মেয়েকে পরতে হয় সাদা ধুতি—করতে হয় একাদশী—ভালো খাবার নিষেধ—হবিষ্যি—এই সব দেখে তিনি কাতর হ'য়ে পড়্‌তেন। মেয়ে হবিষ্যি করে—

এইজন্যে তিনি মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেকদিন পরে মেয়ে হেমলতার বিশেষ অনুরোধে মাছ খেতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। এই রকম দুঃখের দিনে হেমলতা দেবীর দুটি ছেলে তাঁর হতাশ প্রাণে সান্ত্বনার জল ছিটিয়ে দিতেন।

কেটে গেল পাঁচ বছর। খবর এল ঠাকুরদাস কাশীতে আবার অসুখে পড়েছেন। আবার সকলেই চল্‌লেন কাশীতে ;—বিদ্যাসাগর গেছেন—সেবা-যত্ন করবার জন্যে। ঠাকুরদাস আবার সেরে উঠ্‌লেন। কেউ কেউ রইলেন ; বিদ্যাসাগর ফিরে এলেন—কল্‌কাতায়। দু-মাস পরেই চৈত্র সংক্রান্তির দিনে কলেরা রোগে স্বামীর কোলে মাথা রেখে সতী-লক্ষ্মী ভগবতী দেবী হঠাৎ কাশী পেয়ে গেলেন। ১২৭৭ সালের ৩০এ চৈত্র। বিদ্যাসাগর তখন কাশীতে ছিলেন না। খবর গেল কল্‌কাতায়। খবর পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের অবস্থা কি হয়েছিল, বুঝ্‌তেই পারো। এই মা চলে' গেলেন! বিদ্যাসাগরের দুঃখ রাখবার জায়গা নেই। কোনো রকমে মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি সেরে পূরো এক বছর হবিষ্যি করে' জুতো-চাদর ছেড়ে—ছাতা মাথায় না দিয়ে—একবেলা খেয়ে কাটিয়েছিলেন—মায়ের ওপর শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে—শাস্ত্রের বিধান মেনে।

পাঁচ বছরেরও বেশী কেটে গেল। এই সময়ে তাঁর বাবাও একদিন কাশী পেয়ে গেলেন—১২৮৩ সালের ১লা বৈশাখ। এবার

তিনি ও তাঁর ভাইরা সকলেই কাশীতে ছিলেন। তাঁরাই বাবার মৃতদেহ নিয়ে গেলেন—কাশীর মহাশ্মশান মণিকর্ণিকার ঘাটে। কয়েকদিন পরে ফিরে এলেন—সকলেই। এখন বিদ্যাসাগর গোলমাল ভালবাসেন না—নির্জনে চুপচাপ বসে' থাকেন। কারো সংগে তেমন কথাও বলেন না। তাঁর শরীর ভেঙে গিয়েছিল—আগেই; টম্‌টম হ'তে আছাড় খেয়ে। নানারকম অসুখ হ'তে লাগ্‌লো। এই অবস্থায় কেটেছিল তাঁর কিছুদিন। এই সময়ে তিনি তাঁর সম্পত্তির একটা উইলও করেছিলেন। তাতে নির্দেশ ছিল—বীরসিংহ গ্রামের ভগবতী বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা, ঐ গ্রামের ডাক্তারের জন্য ৫০৲ টাকা, অনাথ ও নিরুপায় লোকদের জন্য সাহায্য ৩০৲ টাকা, বিধবা বিবাহের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা—মোট ২৮০৲ টাকা খরচ হবে। এ-ছাড়া ৪৫ জন গরীবকে বৃত্তি দিতেন—২৮১৲ টাকা। দুয়ে মিলিয়ে খরচ হবে—৫৬১৲ টাকা।

দারুণ দুঃখে তাঁর দিন কেটে যাচ্ছে···কিছুতেই তিনি শান্তি পাচ্চেন না···সর্বদাই মন হু-হু করে। এই অবস্থা দেখে একদিন এক ভদ্রলোক তাঁকে বলেছিলেন—আপনার শরীরের যে-রকম অবস্থা, তাতে এখন কিছুদিনের জন্যে কার্‌মাটারের বাড়ীতে থাক্‌লে ভালো হ'ত। তা'র জবাবে তিনি কাতর হ'য়ে, কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন—আমার কি যাবার পথ রেখেছি! আমি আমাকে কাজের মধ্যে এমনি জড়িয়ে ফেলেছি যে, কোথাও

যাবার উপায় রাখিনি। এই কথা বলেই চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে হাতের খাতাখানি সেই ভদ্রলোকের দিকে ফেলে দিয়েছিলেন। ঐ খাতাখানিতে তাঁর মাসিক দানের হিসাব লেখা থাক্‌তো। তাতে দেখেছিলেন তিনি, তাঁর তখন মাসিক দান ছিল প্রায় ৮০০৲ টাকা। এই জন্যে কল্‌কাতা ছেড়ে কোথাও যেতে পারতেন না, তিনি।

বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবনের বিশৃংখলার মধ্যে একটি সুখ-শান্তির কথা বলে' আমরা অন্যদিকের কথা বল্‌বো। অনেক দিন পরের কথা। বিদ্যাসাগর কিছুদিন পরে মেয়েদের তাঁর বাদুড়বাগানের বাড়ীতে নিয়ে একটু শান্তিতে থাক্‌তেন। সেই সময়ে তিনি তাঁর ছোট ছোট দৌহিত্রদের নিয়ে একটু আরাম পেতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি তাঁর মেয়েদের আর তাঁদের ছেলেদের নিয়ে তাঁর বস্‌বার ঘরে বসে' গল্প-গুজব করতেন। বিদ্যাসাগর খুব পান খেতেন। নাতিরা চাইতো—দাদুর চিবানো পান। তিনি মুখ থেকে চিবানো পান বের করে' দিতেন। এই রকম দিতে দিতে মুখের পান ফুরিয়ে গেলে আবার যদি কেউ ঐ চিবানো পান চাইতা, তা হ'লে তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌তেন —দাঁড়া, সম্বুরে দি। এই সম্বুরে দেওয়া তিনি কা'কে বল্‌তেন, বলতো? তখ্‌খনি আর একটা পান মুখে দিয়ে চাকরকে বল্‌তেন—তামাক দিতে। চাকর তামাক সেজে দিলে হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে হুঁকোর ধোঁয়ায় ঐ চিবানো পানে তামাকের গন্ধ

লাগিয়ে দেওয়া। মেয়েরা হেসে উঠ্‌তেন—ছেলেরাও হাসির তরংগ তুলে দাদুর সাম্‌নে নেচে বেড়াতো।

বিদ্যাসাগর নাতিদের দেবার জন্যে নূতন চক্‌চকে টাকা, আধুলি, সিকি, দুআনী, পয়সা সকল সময়েই নিজের কাছে রাখ্‌তেন। নাতিদের—এমন কি মেয়েদের যে যখন চাইতো তখন তিনি তাদেরকে দিতেন। নাতিদিগকে জিজ্ঞাসা করতেন "দাদা, বলতো তোমরা কা'কে ভালবাসো। তা'রা বোল্‌তো দাদু, তোমাকেই খুব ভালবাসি, আর তোমার চেয়ে তোমার ঐ নতুন নতুন সিকি-দুআনীকে বেশী ভালবাসি। রসিক দাদু তখন বলে' উঠ্‌তেন—সকলেই তাই করে; তবে তোমরা বোঝ না, তাই বলে' ফেলো, অপরে কিন্তু ও-কথা স্বীকার করে না!"—এমনি হাসি-তামাসা-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে কাট্‌তো তাঁর সান্ধ্য মজ্‌লিস্‌। শুন্‌লে গল্পটি—এই গল্পটি তোমাদের খুব ভালো লাগ্‌লো বলে' যেন আমার মনে হচ্চে।

দরদী বিদ্যাসাগর

দেশের লোক যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছে ছিল—ছেলেবেলা হ'তেই। এই জন্যে তিনি চাকরী ছেড়ে দেবার সংগে সংগে কল্‌কাতাতেই একটি স্কুল খুলে তার নাম দিলেন—মেট্রপলিটান স্কুল। এখন সেই স্কুলই হয়েছে বিদ্যাসাগর কলেজ। এই কলেজ খুল্‌তে, কলেজের বাড়ী তৈরী করবার জন্যে জায়গা কিন্‌তে, তাঁকে অনেক অসুবিধা ঠেলে অগ্রসর হ'তে হয়েছিল। এখন সেই কলেজ একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কার্যক্ষেত্র হয়েছিল, বহু-বিস্তৃত। কলেজের সাফল্য দেখে বিদ্যাসাগরের প্রাণে জেগে উঠেছিল জ্ঞান-বিস্তারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। সেই চেষ্টাতে তিনি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, শেষে। এই কাজে অনেকে বাধাও দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁরি চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজে সব ছেলেই সংস্কৃত পড়তে পারবে বলে' স্থির হ'ল—কেবল ধর্মশাস্ত্র পড়বার অধিকার রইলো ব্রাহ্মণ-বৈদ্য সন্তানদের। তা'রাই ধর্মশাস্ত্র পড়বে; সংস্কৃত কলেজে এই নিয়ম করে' দিয়ে চলে' গেলেন—তাঁর জন্মস্থান বীরসিংহে। মাকে ও বাবাকে বল্‌লেন এখন আমি বীরসিংহে একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল করবো ইচ্ছে ক'রে এসেছি। এ-বিষয়ে আপনাদের অনুমতি চাই। এই কথা শুনে পিতা ঠাকুরদাস ও মাতা ভগবতী দেবী খুবই খুসী হ'য়ে ছেলেকে সম্মতি দিলেন। হুকুম পেয়েই সেই দিনই স্কুলের জন্য জায়গা ঠিক

করে' পরদিন বনেদ খোঁড়া হবে, ঠিক হ'ল। দুঃখের বিষয়, সেদিন আর মজুর পাওয়া গেল না। কিন্তু এই বাধা পেয়ে বিদ্যাসাগর কাজ বন্ধ রাখলেন না। ফুল ফুট্‌লেই মলয় বাতাস এসে হাজির হয়—সৎ ইচ্ছে জাগ্‌লেই জেগে ওঠে কর্মী। বিদ্যাসাগরের পাশে এসে দাঁড়ালেন দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র। ধরলেন কোদাল বিদ্যাসাগর নিজে—সহায় হ'লেন তাঁর দু-ভাই। দেশের লোকের উৎসাহ জেগেছে ; কেউ কেউ এসে তাঁদের তিনজনের সংগে যোগ দিলেন।—সাধু ইচ্ছার পবিত্র ত্রিবেণী-তীর্থে মিললো অসংখ্য নদ-নদী। অল্প দিনের মধ্যেই স্কুলের ঘর তৈরী হ'য়ে গেল। ৫।৭ দিনের মধ্যে একশ-র বেশী ছেলে এসে জুট্‌লো, এই স্কুল হ'ল অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলেদের জন্যে। কিন্তু গরীব চাষা-ভূষো, মুটে-মজুর রাখাল বালক এদের তো এতে বিশেষ সুবিধা হবে না ভেবে বিদ্যাসাগর তাদের জন্যে খুলে দিলেন—নৈশ বিদ্যালয়। অর্থাৎ রাত্রিতে পড়ানো হ'ত সেই সব স্কুলে। কাজেই, গরীবের ছেলেদের পড়বার সুযোগও হ'য়ে গেল। এই স্কুলে যে-সব ছেলে পড়্‌তো, তাদের স্কুলের মাইনে তো দিতেই হ'ত না। তা'রা সকলেই পেত—পড়্‌বার বই, কাগজ, কলম, শ্লেট পেন্‌সিল, আরো কত কি ! এতে প্রায় মাসে তিন-শ টাকা খরচ পড়্‌তে লাগ্‌লো। এ-ছাড়া স্কুলে যাঁরা শিক্ষক ছিলেন মাইনে আর অন্যান্য খরচে তাঁদের পেছনে আরো প্রায় চার শত টাকা পড়্‌তো। এই খরচ চালিয়ে এসেছেন বরাবর বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর যে উচ্চ ইংরাজী

স্কুল স্থাপন করেছিলেন, সেই স্কুলের নাম তিনি রেখেছিলেন—"ভগবতী বিদ্যালয়"। "ভগবতী ইনস্টিটিউশন"* নামে পরিচিত হ'য়ে ঐ স্কুল এখনো বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পুণ্য স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে।

বীরসিংহে তখন ভালো ডাক্তার ছিল না। বিদ্যাসাগর ভগবতী ইন্‌স্টিটিউশন হ'তে যে-সব ছেলে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হ'তো তাদের কল্‌কাতায় নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে নিজের খরচায় পড়াতেন-ডাক্তারী। তা'রা ডাক্তারী পাশ করে' দেশে চিকিৎসা আরম্ভ করতো। এইরূপ ব্যবস্থায় সে-সময়ে সেখানকার লোকদের অনেক উপকার ও সুবিধা হয়েছিল। এ-ছাড়া ঐ স্কুল হ'তে যে-সব ছেলে ভালো করে' পাশ করতেন, তাঁরা বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সাহায্য পেয়ে উচ্চ শিক্ষা পেতেন; আর তা'তে তাঁদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়্‌তো যথেষ্ট। তিনি যখন যেখানে যেতেন, সেইখানকার ধনীলোকদের দিয়ে অনেক ভালো ভালো কাজ করিয়ে নিতেন। এই সকল কাজের দ্বারা তাঁর লোকহিত সাধনের ইচ্ছে এবং লোকদের লেখা পড়া শেখাবার ইচ্ছে আর তার সংগে মানুষের সকল রকম মংগল করবার ইচ্ছে প্রকাশ পেতো।

আগেই বলেছি বিদ্যাসাগর কল্‌কাতায় মেট্রপলিটান কলেজ স্থাপন করেছিলেন—নিজের চেষ্টায় আর নিজের টাকায়। তাঁরই

* সম্প্রতি এই স্কুল ভগবতী মাল্‌টি পারপাস্‌ ইনস্টিটিউশান নামে অভিহিত হয়েছে।

দেখাদেখি বহরমপুর কলেজ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, বর্ধমান রাজ-কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ব্রজমোহন কলেজ, তেজনারায়ণ কলেজ, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের ইচ্ছে জাগ্‌তো—কি করলে জগতের মঙ্গল হয়! এই ইচ্ছের জন্যেই তিনি আর আপনাকে নিজের সংসারের মধ্যে ধরে' রাখ্‌তে পারেন নি। তাই তাঁর কার্যক্ষেত্র হয়েছিল বিশাল বিশ্ব। জেগেছিল তাঁর প্রাণে জীবপ্রেম। এই কারণেই তিনি যেমন দুর্গত মানুষের দুঃখ দেখে কাঁদ্‌তেন, তেমনি ইতর প্রাণীদের কষ্টও তাঁর প্রাণে বেদনা দিত। গরীবের ছেলে লেখা-পড়া শিখ্‌তে পাচ্চে না—পয়সার অভাবে। এজন্যে তিনি তাঁর কলেজে অনেক ছাত্রকে বিনা-মাইনেতে পড়বার সুবিধা করে' দিয়েছিলেন। বীরসিংহের স্কুলে যত ছেলে পড়্‌তো, তাদের তো মাইনে দিতে হ'ত না—বেশীর ভাগ তা'রা পেত—বই, শ্লেট, কাগজ, কলম, পেন্‌সিল প্রভৃতি। তাঁর এইরূপ ব্যবহার দেখে কেউ কেউ তাঁকে ঠকাতেও ছাড়ে নি। এ-বিষয়ে কয়েকটি গল্প বলি শোন:—কল্‌কাতার একটি বড় লোক এক মা-বাপ-মরা ছেলেকে বিনা বেতনে তাঁর স্কুলে পড়তে দেবার সুপারিস করেন। ছেলেটি তাঁর স্কুলে ভর্তি হ'ল। এক দিন বিদ্যাসাগর গেছেন—স্কুল দেখ্‌তে। সাম্‌নেই দেখ্‌লেন সেই ছেলেটিকে। সেই ছেলেটির পোষাক দেখে তাঁর মনে সন্দেহ জাগ্‌লো—এ ছেলে তো গরীবের ছেলে হ'তে পারে না; একটু

পরেই তাঁর মনে হ'ল হয়তো এগুলি তা'র পুরানো পোষাকই বা হবে। তখন টিফিনের ছুটি হ'য়েছে—চাকর এসে ছেলেটিকে খেতে দিল এক বাটী দুধ আর তা'র সংগে দুটো ভালো সন্দেশ। দেখেই তাঁর আগেকার সন্দেহ আবার জেগে উঠ্‌লো। তিনি খোঁজ নিয়ে জান্‌লেন—যে ভদ্রলোকটি ঐ ছেলেটিকে বিনা-মাইনেতে তাঁর স্কুলে ভর্তি করে' নিতে বলেছিলেন—তিনি ঐ ছেলেটির ভগিনীপতি, আর তিনি বেশ ধনী ব্যক্তি। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁর। এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর খুব দুঃখ করে' বলেছিলেন—আমাদের দেশে এমন অপদার্থ ভদ্র সন্তানও জন্মায়!

আর একটি ঘটনা বলি ঃ—উত্তরপাড়া হ'তে একটি ছেলে তার মা-বাপ নাই—বড় গরীব সে—কোনো রকমে স্কুলের মাইনে জোগাড় করে' উত্তরপাড়া স্কুলে পড়্‌ছে; কিন্তু এ-বছরে ক্লাস প্রমোশন পেয়ে নূতন বইয়ের অভাবে তা'র পড়া-শুনার ব্যাঘাত হচ্ছে জানিয়ে বিদ্যাসাগরকে চিঠি লেখে; আর যে যে বই পড়া হবে তা'র তালিকাও পাঠিয়ে দেয়। বিদ্যাসাগর চিঠি পেয়েই তালিকা মতো সব বই আনিয়ে তা'কে ডাকে পাঠিয়ে দেন। পাঁচ-ছ বছর এইরূপ চলে। সেই ছেলেটি প্রত্যেক বছরেই ক্লাস প্রমোশন পেয়েছে—এই এই বই চাই জানিয়ে চিঠি দেয় আর তিনিও সব বই পাঠিয়ে দেন। হঠাৎ একদিন তাঁর স্কুলে ঐ উত্তরপাড়া স্কুলের হেডমাষ্টার কোনো কাজে আসেন। বিদ্যাসাগর সেই ছেলেটির কথা জিজ্ঞাসা করলে হেডমাষ্টার বল্‌লেন—সে-নামে তো সে-ক্লাসের কোনো ছেলে পড়ে না। বিদ্যাসাগর তাঁর

তেমনি ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন—আপ্‌নি কি রকম মাষ্টার—ক্লাসের ছেলেদের নাম পর্যন্ত জানেন না! হেডমাষ্টার বলেছিলেন আমি সব ছেলেকেই চিনি—কই কোনো ছেলের তো এই নাম মনে হচ্ছে না। পরে একটু ভেবে বল্‌লেন—ছেলেটির স্কুলে এক নাম—বাড়ীতে তা'কে হয়তো অন্য নামেই ডাকে। এই মনে করে' তিনি বল্‌লেন—আচ্ছা, আমি খবর নিয়ে আপনাকে জানাবো। অন্যান্য কথাবার্তা সেরে হেডমাষ্টার চলে' গেলেন। পর দিনই সেই ক্লাসে গিয়ে ছেলেটির খোঁজ করলেন; কিন্তু সে-নামে কোনো ছেলের সন্ধান তিনি পেলেন না। ছেলেটি আজ পাঁচ-ছ বছর এই স্কুলে পড়্‌ছে। বরাবর সে বিদ্যাসাগরের কাছ হতে বই আনায়। ব্যাপার কি-জান্‌বার জন্যে স্কুলের কয়েকজন শিক্ষককে আর বড় বড় ছেলেদেরও বল্‌লেন। পরদিন ঐ স্কুলের একটি ছেলে খবর দিল—ঐ নামের এক ছোক্‌রার স্কুলের বাইরে বইয়ের দোকান আছে—বোধ হয় সে-ই হবে। হেডমাষ্টার তখ্‌খনি সেই বইয়ের দোকানদারকে ডেকে পাঠালেন। সেই লোকটি বুঝতে পারে নি—হেডমাষ্টার কেন ডেকে পাঠিয়েছেন। আস্‌তেই হেডমাষ্টার তা'কে ঐ কথা জিগ্‌গেস করবামাত্র সেই ছোক্‌রা মাথা হেঁট করে' রইলো আর একে একে সব স্বীকারও করলো। হেডমাষ্টার পরদিন বিদ্যাসাগরকে এই ছেলের কথা জানালেন। বিদ্যাসাগর চিঠি পড়ে' ভেবেছিলেন—যে-দেশে এমন ছেলে জন্মায়, সেই দেশের উঠ্‌তে এখনো অনেক দেরী আছে।

এই রকম করে' বিত্থাসাগরকে অনেক লোকে অনেক রকমে ঠকিয়েছে।

আরো একটি গল্প বলি শোন, কিন্তু এ ঠকানো গল্প নয়।... খুব মজার কথা? বিত্থাসাগর তাঁর বৈঠকখানায় বসে' আছেন। এমন সময় তাঁর চেনা এক ভদ্রলোকের সংগে এক অচেনা লোক এলেন। তাঁর চেনা লোকটি বল্‌লেন—এই ভদ্রলোক খুবই বিপদে পড়েছেন—একটা মিথ্যে মোকদ্দমায়। শুনানির দিন আজ। ইনি মনোমোহন ঘোষকে তাঁর পক্ষে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর ফি ৭০০৲ টাকা। এঁর বাড়ী হ'তে টাকা এখনো আসে নি—হয়তো ৪।৫ দিনের মধ্যেই আস্‌বে। আপনি দয়া করে' ঘোষ মশাইকে আজকের কাজটি চালিয়ে দেবার জন্যে একটু লিখে দিন্—এঁর বাড়ী হ'তে টাকা এলেই তাঁকে ঐ টাকা দেওয়া হবে। শুনে বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—এক জনের এক পা জেলে আর এক পা বাইরে...তা'র টাকা বাকি রেখে কাজ করতে বলা যায় না। তার পর ঘোষের সংগে আমার তেমন পরিচয়ও নেই। তিনি যখন বিলাত যান, তখনি তাঁর সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল মাত্র। এরূপ অবস্থায় তাঁকে আমি এ-রকম অনুরোধ করতে পারি না। যদি তাঁর সংগে আমার ঘনিষ্ঠতা বেশী থাক্‌তো বা এই রকম অনুরোধ দু-একবার করতাম্ তা হ'লে না হয় আজও করতাম।

শুনেই সেই ভদ্রলোকটি কেঁদে ফেল্‌লেন। ধরা গলায় বল্‌লেন—শুনেছি, কোথাও যার কিনারা হয় না, সে এখানে এলে আশ্রয় পায়! আমার সে-ভরসাও গেল! এই বলে সেই ভদ্র-

লোকটি দীন নয়নে বিদ্যাসাগরের দিকে চেয়ে রইলেন। সাগরে তুফান উঠ্‌লো···চোখ মুছে লিখ্‌তে বস্‌লেন—My dear Ghose ···আর লিখ্‌তে পারলেন না।···কতকক্ষণ কেটে গেল তেমনি। পরে বলে' উঠ্‌লেন—একাজ আমার দ্বারা হবে না! তখন ঐ ভদ্রলোক কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লেন—তবে কি আমি জেলেই যাবো? শুনেই তাঁর প্রাণে জেগে উঠ্‌লো—সমবেদনার ভাগীরথী। বিদ্যাসাগর তাঁর বাক্স খুলে বের করলেন তাঁর ব্যাংকের চেক্ বই। মনোমোহন ঘোষের নামে একখানা ৭০০৲ টাকার চেক্ লিখে ঐ লোকটির হাতে দিয়ে বল্‌লেন—ব্যাংকে আমার টাকা নেই···এই চেকখানি ঘোষকে দিয়ে বোলো তিনি যেন আজ এই চেক্ ব্যাংকে না পাঠান—কাল বেলা ১১৷৷টার পর যেন পাঠান। আমি আজই যেরূপে পারি টাকা যোগাড় করে' ব্যাংকে জমা করে' দেবো।

সেই দিন সেই মোকদ্দমায় দারোগা বাবুটি খালাস পেয়ে গেলেন। চার দিনের দিন দারোগা বাবু আর তাঁর সেই বন্ধুটি ৭০০৲টাকা নিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন। খালাস পেয়েছেন জানিয়ে টাকাগুলি তাঁর সাম্‌নে রাখ্‌লেন। এতে বিদ্যাসাগর কোনো কথাই বল্‌লেন না দেখে তাঁরা দুজনেই অবাক্ হ'য়ে গেছেন। এমন সময়ে বিদ্যাসাগর বললেন, তাঁর বন্ধুটিকে—তুমি আমার সংগে চালাকি কেন করলে বলো তো? আর দারোগা বাবুর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে আমাকে ঠকালে কেন, তা বুঝতেই পারচি নে।···একটু পরেই দারোগা বাবুকে বল্‌লেন—তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বল্‌লে কেন?

দারোগা বাবু বল্‌লেন—না মশাই, আমি নাটোরের পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর…খোঁজ করলেই জান্‌তে পারবেন! শুনেই বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—দেবো বলে' কেউ টাকা দেয় না…যে-দেশে টাকা নিয়ে আর দিতে চায় না, সে-দেশে তুমি পুলিশের দারোগা হ'য়ে, সাত দিনের কড়ারে টাকা নিয়ে চারদিনের দিনে টাকা দিতে এসেছ, কেমন করে' বিশ্বাস করি বলো তো? তোমাকে যে-রকম দেখ্‌ছি, তা'তে মনে হচ্চে—জজ সাহেব ভুল করে' তোমাকে খালাস দিয়েছেন। যাই হোক, অনেক ঠাট্টা-তামাসার পর বিদ্যাসাগর টাকা গুণে নিয়ে বাক্সে রাখবার সময় বল্‌লেন, ওহে, আট আনা কম দিলে কেন? টাকা তাঁরা ঠিকই এনেছিলেন…আট আনা কম হ'ল ভেবে তাঁরা আশ্চর্য হ'য়ে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। ক্ষণ পরে তামাসা ছেড়ে বল্‌লেন—এই টাকা ব্যাঙ্কে রাখ্‌তে গেলে গাড়ী-ভাড়া আট আনা লাগবে তো! হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলেন—যখন এত লোকসানই আমার করলে, তখন আরও কিছু লোকসান কর। এ লোকসানটা কি, তা আর কি তোমাদের বল্‌তে হবে! এ লোকসান জলখাবার…বড় বড় রসোগোল্লা আর আতর-মেশানো সন্দেশ!! বুঝেছ?

বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে নানা কথা

(১)

বিদ্যাসাগরের স্বভাবটি ছিল খুব সুন্দর। তিনি বন্ধুদের নিয়ে নানারকম আমোদও করতেন, আবার তাঁদের সংগে খুব ঠাট্টা-তামাসাও চল্‌তো। একটি বন্ধুর সংগে একবার তাঁর রঙ্গরসের কেমন আলোচনা হয়েছিল, তোমাদের শোনাই:— বন্ধুটির নাম হরানন্দ ভট্টাচার্য। ইনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বাবা। তিনি কাশীবাস করেন, আর দরকার পড়্‌লে মাঝে মাঝে দেশেও আসেন। একবার দেশে এসে তিনি বিদ্যাসাগরের সংগে দেখা করতে এলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে আদর করে' বসিয়ে চাকরকে বল্‌লেন—তামাক সেজে দিতে। চাকর তামাক সেজে দিয়ে গেল। ভট্টাচার্য মশাই তামাক টানছেন। বিদ্যাসাগর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—

—তুমি মরেছ না কি?

—কেন, আমি মরবো কেন? মলে' কি আস্‌তে পারতাম তোমার কাছে।

—আমিও তো তাই বলি, না মলে' কি আস্‌তে পারতে! দেখো, আমাকে যেন পেয়ে বোসো না।

মাঝে আরো দু-একটা কথার পর বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—তোমায় শেষটা কাশীতে খেলে, মরবার বুঝি আর জায়গা জুটলো

না! তা গেছ ত আবার এ রকম সরে' পড় কেন? জানো তো কাশীবাস করে' বাইরে মলে' কি হয়? ভট্টাচার্য বল্‌লেন—হাঁ, তা ত জানি, তবুও দায়ে পড়ে' মাঝে মাঝে আস্‌তে হয়। বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—শিগ্‌গির শিগ্‌গির পালাও, না হ'লে কাশীর এপারে ওপারে অনেক তফাৎ; এপারে শিব—ওপারে গাধা। বলি, একটু গাঁজা-টাঁজা খেতে শিখেছ কি? ভট্টাচার্য বল্‌লেন—কেন গাঁজা খেয়ে কি হবে? বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—বলি একটু অভ্যাস রেখো; কি জানো, কখন্ কি কাজে লাগ্‌বে—বলা তো যায় না। মনে কর, যদি তুমি কাশী পেয়ে যাও, তা হ'লে তো শিব হবে! শিব হ'লে তোমার নন্দী-ভৃঙ্গী যখন গাঁজার আলবোলা ধরবে, তখন টান্‌তে হবে তো? আগে থেকে অভ্যাস না রাখ্‌লে দম আট্‌কে মরে' যাবে, আর তোমার সাধের শিবত্বও ফস্‌কে যাবে। কেমন মধুর আলোচনা, বলো তো!

(২)

এই রকম আর একটি গল্প বলি:— তাঁরা ৮।১০ জন বন্ধু করতেন কি জানো? তাঁরা দল বেঁধে হঠাৎ একদিন এক বন্ধুর বাড়ীতে যেয়ে হাজির হ'তেন। এঁদিকে তাঁর খাওয়াতে কিছু খরচ হ'ত, বুঝ্‌তেই পারছো। একবার তাঁরা একদল গেছেন—এক বন্ধুর বাড়ীতে। বন্ধুটি বুঝ্‌লেন—তাঁদের এই রকম দল বেঁধে আসার কারণ। বুঝেই তাঁদের খাবারের জমকালো গোছের আয়োজন করে' দিলেন। খেলেন খুব সব্বাই। পরদিন হ'ল এক বন্ধুর পেটের অসুখ। অনেক সেবা-শুশ্রূষার পরে রোগী

সুস্থ হ'লেন। সেবা করবার সময় বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বল্‌লেন—এর পেটের দোষ আছে—এ'কে আর আমাদের দলে নেওয়া হবে না। এই কথা শুনেই বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—এ'কে তা করলে চল্‌বে না—যে-ব্যক্তি এই কাজে প্রাণটাও দিতে পারতো, তা'কে বিদেয় করে' দিলে কা'কে নিয়ে থাক্‌বে তোমরা!

(৩)

কয়েকখানা শাল কেনবার জন্যে বিদ্যাসাগর গেছেন তাঁর এক বন্ধুর সংগে বড়বাজারে। তিনি যেম্‌নি শালওয়ালার উপরের ঘরে উঠেছেন—অমনি শালওয়ালা বলে' উঠ্‌লো—আইয়ে পণ্ডিতজী, আজ হামারা সুপ্রভাত হ্যায়। (পণ্ডিতজী আসুন—আজ আমার সুপ্রভাত!) বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—আমায় চিন্‌লেন কি করে'? শালওয়ালা বলেছিল—ক্যা পণ্ডিতজী! আগ কি কভি ছিপা রহে থাক্‌সে? (পণ্ডিতজী! আগুন কি কখনো ছাইয়ে ঢাকা থাকে?) কল্‌কাতার বেশীর ভাগ লোকই তাঁকে চিন্‌তেন যে!

(৪)

বিদ্যাসাগরকে যদি কখনো কোথাও যেতে হ'ত, তা হ'লে তিনি প্রায়ই হেঁটে যেতেন। একবার যাবেন তিনি এক জায়গায়—ট্রেণে। বাসা হ'তে গেলেন ।/০ পাঁচ আনা গাড়ী-ভাড়া দিয়ে। ট্রেণ না পাওয়ায় ফিরে আস্‌তে হ'ল। এবারেও ।/০ পাঁচ আনা গাড়ী ভাড়া দিতে হ'ল। যাওয়া-আসায় ॥৵০ দশআনা গাড়ী-ভাড়া লাগ্‌লো। এই ॥৵০ দশ আনা পয়সা বৃথা খরচ হ'য়ে গেল

বলে' তিনি দুঃখ করছিলেন। কাছে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বিদ্যাসাগরের এই কথা শুনে হেসে উঠ্‌লো দেখে বিদ্যাসাগরও হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলেন—তোমরা হাস্‌ছো কেন? একজন লোক বলে' উঠ্‌লো—এমন কত দশ আনা যাচ্চে! তিনি বলেছিলেন—এটা তো অপব্যয়! শুনেই আর একটি লোক বলেছিল—আপনার কত দশ আনা কত দিকে যাচ্চে—কত লোক ঠকিয়ে আপনার কাছ হ'তে কত টাকা নিয়ে যাচ্চে—তা তো দেখ্‌ছেন না! শুনেই তিনি বলে' উঠেছিলেন—সেইটাকেই কি তোমরা অপব্যয় বল্‌চো? সে ত হাতে তুলে দিলাম একজনকে। আর কিছু না হোক, যে তা পেল, সে মনে করলো এতে তা'র উপকার হ'ল আর এ যে "ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়"। যে-ব্যক্তি সে-পয়সা পেল, সে মনে করলো সে তা'র মেহনতানা; আর আমি দিলাম, কিন্তু তা'তে আমার কোনো উপকার হ'ল না। শুনে অনেকেই বলেছিলেন—পয়সা খরচ করার হিসেবটা যে এতটা উঁচু, তা আমাদের জানা ছিল না।

(৫)

বিদ্যাসাগর খুব হিসাবী লোক ছিলেন। কোথাও একটু দড়ি কিংবা এক টুক্‌রা কাগজ দেখ্‌তে পেলে তা কুড়িয়ে রাখ্‌তেন—যত্ন করে'। দরকার পড়্‌লে সেই সব টুক্‌রো কাগজ, কাউকে ছোট পত্র লিখ্‌তে বা প্রেসের কোনো কাজে ব্যবহার করতেন। কোনো জিনিষ বাজে নষ্ট হোক, এ তিনি চাইতেন না। একবার এক দাসী হলুদ বেটে তা'র শিল-ধোওয়া জলটা

ফেলে দিল দেখে বলেছিলেন—হলুদের জলটা ফেলে দিলে কেন? সেই দাসী অবাক্ হ'য়ে ঠাট্টা করে' বলেছিল—দাদা মশাইয়ের কত দিকে কত টাকা যাচ্চে—সেদিকে নজর নেই—নজর পড়েছে এই হলুদের জলটুকুর দিকে। তা'র উত্তরে তিনি বলেছিলেন—আমি তো টাকা জলে ফেলে দি না—লোককে দি। জিনিষ নষ্ট হবে কেন? হলুদের জল তরকারীতে দিলে কাজে লাগ্‌তো তো! এমনি ছিল তাঁর সব দিকে দৃষ্টি!

(৬)

এবার শোন তাঁর এক মহত্ত্বের কথা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ—আজ হ'তে ৯৫ বছর আগের কথা। বাংলার অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ফ্রান্সের ভার্সেলিস নগরে নানা বিপদে পড়ে' চারদিক অন্ধকার দেখ্‌ছিলেন। দেশে অনেকের কাছেই তাঁর টাকা পাওনা ছিল। বারবার চিঠি লিখেও তিনি কারো কাছ থেকে টাকা পেলেন না। শেষে অন্য উপায় না পেয়ে নিজের অবস্থা জানিয়ে—খেতে পাচ্চেন না, টাকা দিতে না পারলে জেলও হ'তে পারে জানিয়ে বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখ্‌লেন—

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত জগতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে দীনের বন্ধু!.........

এই চিঠি পেয়ে বিদ্যাসাগর খুবই চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌লেন। সে-সময়ে তাঁর খুবই টানাটানি চল্‌ছে···। এই রকম দুর্দিনে মধুসূদনের কষ্ট জেনে টাকার জন্যে অনেক জায়গায় চেষ্টা

করলেন। মধুসূদনের বন্ধুদেরও ঐ চিঠি দেখিয়ে টাকা পাঠাতে বললেন। কিন্তু সকলেই রইলেন—চুপ করে'। তিনি তো আর চুপ করে' থাকতে পারেন না! ১৫০০৲ টাকা ধার করে' পরের ডাকেই পাঠিয়েদিলেন, মধুসূদনকে। যে-দিন ডাক পৌঁছবার কথা, সেই দিন হোটেলের টাকা দিতে না পারলে হয় তো তাঁকে জেলে যেতে হ'ত। টাকার জন্যে আদালতের লোক বসে' আছে। মধুসূদন তা-দিকে বলে' রেখেছিলেন—ভারতবর্ষের ডাক আসবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন আমি যাঁকে টাকার জন্য লিখেছি, তিনি চিঠি পেয়েই তা'র পরের ডাকে নিশ্চয়ই টাকা পাঠিয়েছেন—হয় তো আজই পাবো। বলতে কি, এই রকম কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময়ে ডাকঘরের লোক তাঁর হাতে দিল ফরাসী দেশের টাকা—ভারতের ১৫০০৲ টাকার জায়গায় ২৪৯০ ফ্রাঙ্কের হুণ্ডি! টাকা দিয়ে মধুসূদন নিষ্কৃতি পেলেন। এর পর তিনি বিদ্যাসাগরকে তাঁর হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। এক চিঠির শেষে তিনি লিখেছিলেন—"কেমন, আমি কি ঠিক বলি নাই যে, আপনার হৃদয় বাঙ্গালী মায়ের মতো?"

দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে—মাইকেল দেশে ফিরে এসেও বিদ্যাসাগরের এই টাকা শোধ করতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীর তিন ভাগের এক ভাগ বিক্রী করে' ঐ টাকা শোধ করেছিলেন।

কিছুদিন পরের কথা—মাইকেল দেশে ফিরে আস্‌বেন। বিদ্যাসাগর মাইকেলকে খুবই ভালোবাস্‌তেন। এই জন্যে তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে তা'কে মাইকেলের রুচি অনুযায়ী সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখ্‌লেন। কিন্তু মাইকেল উঠ্‌লেন না—সেই বাড়ীতে। উঠ্‌লেন তিনি এক সাহেবী হোটেলে। এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগর খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।

নানারকম যন্ত্রণা ভোগ করে' মাইকেল মারা গেলেন—হাঁসপাতালে। বাংলার এত বড় কবির এই দুর্দশা বাঙালী বোঝে নাই। মৃত্যুর পর তাঁকে গোর দেওয়া হয়। কয়েক বছর পরে মধুসূদনের হাড় সংগ্রহ করে' তা'র উপরে স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করবার প্রস্তাব হ'লে তিনি বলেছিলেন—দেশের লোক তাঁর 'জান্‌' রাখ্‌বার চেষ্টা করে নাই—এখন হাড় রেখে আর কি বাহাদুরী করবে!—এত অভিমান ছিল তাঁর এ-দেশীয়দের প্রতি।

(৭)

বাংলা ১২৭৬ সালে এ-দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। লোকে খেতে পায় না—কষ্টের সীমা নেই লোকের। বিদ্যাসাগর অন্নসত্র খুলে দিলেন তাঁর বারসিংহের বাড়ীতে। প্রথম প্রথম সেই অন্নসত্রে লোক খেত প্রায় ২০০ জন। ক্রমে লোক বাড়্‌তে লাগ্‌লো। ১০।১২ জন রাঁধুনী তৈরি করত খিচুড়ি, তরকারী প্রভৃতি। অন্নসত্রে যে-সব মেয়ে-পুরুষ খেতে আস্‌তো তাদের রুক্ষু মাথা দেখে বিদ্যাসাগরের খুবই কষ্ট হ'ত। তিনি তাদের মাথায় তেল দেওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু যারা তেল

মাখিয়ে দিত, তা'রা হাড়ি, ডোম, দুলে বলে' তাদের মাথায় তেল মাখিয়ে দিতে ঘৃণা বোধ করে দেখে' দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর তাদের তেল মাখিয়ে দিতেন নিজের হাতে। দেখ তো কত উদার প্রাণ ছিল বিদ্যাসাগরের!

(৮)

বিদ্যাসাগর কলকাতা হ'তে মাঝে মাঝে কারমাটারে গিয়ে থাকতেন—তোমাদের আগে বলেছি। সেখানে তিনি একখানি বাড়ীও করেছিলেন। একবার তিনি কিছুদিন থাকবেন বলে' সেখানে গেছেন। সেখানকার সকলেই বিদ্যাসাগরকে চিনতেন; তাঁর দয়ারও পরিচয় পেয়েছিল, অনেকেই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও জানতেন তিনি। তিনি এসেছেন শুনলেই অনেক লোক তাঁর সংগে সকাল-বিকাল দেখা করবার জন্যে আসতেন—সেখানকার সাঁওতাল-পাড়ার সাঁওতালরাও। একদিন এক মেথর কাঁদতে কাঁদতে এসে বললে—তা'র মেথরাণীর কলেরা হয়েছে—চলো একবার…ওষুধ দিয়ে তাকে বাঁচাও। বলে' কি কান্না! বিদ্যাসাগর হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স নিয়ে চললেন তা'র সাথে; সংগে নিলেন—একটা মোড়া। সেই মোড়ার ওপর বসে' রোগিণীর অবস্থা দেখে নিজের হাতে ওষুধ খাইয়ে দিতেন। মেথরাণী সুস্থ হয়েছে দেখে সকাল বেলায় বাড়ীতে এসে স্নান-আহার করেছিলেন। মানুষের উপর এত দয়া ছিল—দয়ার সাগরের।

(৯)

কারমাটারে অনেক সাঁওতালের বাস। সাঁওতাল পুরুষ-মেয়ে-ছেলে সকলেই তাঁকে ভালোবাসতো। তাঁর সংগে কত আমোদও

করতো। বিদ্যাসাগর যখন সেখানে যেতেন, তখন তিনি সংগে করে' নিয়ে যেতেন নতুন চক্‌চকে টাকা, আধুলি, সিকি, দুআনি, পয়সা ইত্যাদি—আর তা'র সংগে সাঁওতাল পুরুষদের জন্য ভালো ভালো খাবার,—মেয়েদের জন্যে নতুন কাপড়ে-ভরা বাক্স। কেউ খাবার চাইতো···কেউ চাইতো কাপড় ; কেউ বা আরো কিছু। ছেলেদের দিতেন—নতুন চক্‌চকে পয়সা—পুরুষদের দিতেন খাবার—মেয়েদের দিতেন কাপড়। একদিন কয়েকটি মেয়ে এসে বল্‌লো—ও বিদ্যেসাগর, কাপড় দে ! তিনি মজা করবার জন্যে বল্‌লেন—কই রে, কাপড় তো আনিনি এবার। শুনেই একটি মেয়ে বলে' উঠ্‌লো—দে তোর চাবিটা···বাক্স খুলে দে'খ। চাবিটা নিয়ে বাক্স খুল্‌লে—দেখ্‌লো তা'রা নতুন কাপড়ে ভরা। দেখেই তা'রা এক একখানা কাপড় বের করে' নিয়ে বাক্সটা বন্ধ করে' চাবিটা তাঁর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গান করতে করতে চলে' গেল। খুসীতে বিদ্যাসাগরের প্রাণ গেল ভরে'।

আর একবার গেছেন তিনি কারমাটারে—পূজোর সময়। সেবার সংগে নিয়ে গেছেন—দু-বাক্স খেজুর আর স্টেশনের বাবুদের দেবার জন্যে ইলিশ মাছ। বাবুদের তো মাছ পাঠিয়ে দিলেন—রামটহল তাঁর চাকরের দ্বারা। খেজুরগুলো সাঁওতালদের জন্যে লুকিয়ে রেখে দিলেন। একদিন সকাল বেলায় একজন সাঁওতাল পুরুষ এক ঝুড়ি ভুট্টা নিয়ে এসে বল্‌লো—বিদ্যেসাগর, এই ভুট্টা গুলো নে—আর আমাকে দে পাঁচ আনা পয়সা। বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—কেন রে···পয়সা নিয়ে কি করবি ? সাঁওতাল পুরুষটি

বল্‌লে—অত খবরে তোর কাজ কি···আমার দরকার আছে। বিদ্যাসাগর পাঁচ আনা পয়সা দিলেন। চলে' গেল সে। আবার একজন এসে বল্‌লে—এই ভুট্টাগুলো নিয়ে আট আনা পয়সা দে। তাই দিয়ে সেগুলোও নিলেন। এইরূপে কয়েক ঝুড়ি ভুট্টা কেনা হ'ল —কোনো দর-দাম না করেই। দুপুর বেলায় একদল সাঁওতাল এসে বস্‌লো তাঁর উঠানে—মেয়ে-পুরুষ-ছেলে। তা'রা, কতকগুলো শুক্‌নো কাঠ আর পাতা কুড়িয়ে এনেছে। বল্‌লো তা'রা—দে বিদ্যেসাগর, আমাদের খাবার! বিদ্যাসাগর সেই ভুট্টাগুলো তাদের দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—তোদের জন্যে ওই দেখ্‌ খাবার কিনে রেখেছি। যে-ক'টা খেতে পারিস্‌, নে ওখান থেকে। হৈ-হুল্লোড় করে' যার য-টা ইচ্ছে ভুট্টা নিয়ে শুক্‌নো পাতায় আগুন ধরিয়ে তাতে ফেলে দিল শুক্‌নো কাঠ। এইরূপে তা'রা পাঁচজন সাতজন করে' দল বেঁধে এক এক জায়গায় বসে' সেই ভুট্টা পোড়ায়—আর খায়; মাঝে মাঝে গানও করে। খাওয়া শেষ হ'য়ে গেল। এবার তা'রা বাড়ী যাবে! বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—দাঁড়া একটু; এই বলেই এক বাক্স খেজুর খুলে তাদের হাতে আটটা দশটা করে' দিয়ে বল্‌লেন —এইগুলো খেতে খেতে গান গাইতে গাইতে বাড়ী যা। তা'রা চলে' গেল। পরদিন আবার কতকগুলো সাঁওতাল পুরুষ এসে জুট্‌লো। তা'রা আগের দিন আসে নাই। খেজুরের খবর পেয়েই তা'রা এসেছে। বিদ্যাসাগর ভুট্টা আর খেজুর দিয়ে তাদের বিদেয় করেছিলেন। এমনি ছিল বিদ্যাসাগরের সাঁওতালদের ওপর আদর-ভালোবাসা।

(১০)

বিদ্যাসাগর কলকাতায় বাদুড়-বাগানে তাঁর নিজের বাড়ীতে আছেন। লাইব্রেরী ঘরের বইগুলি পরিষ্কার করে' বাঁধানো, কাঁচের আল্‌মারির মধ্যে দেখা যাচ্চে। একজন ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীতে এসে দেখ্‌লেন—বইগুলি খুব বেশী দাম দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। দেখেই তিনি বলেছিলেন—বইগুলি এত বেশী দাম দিয়ে বাঁধিয়ে রাখ্‌বার দরকার কি? বাঁধাতে যে-টাকা খরচ হয়েছে, তা'তে তো অনেক লোকের উপকার করতে পারতেন। এর উত্তরে তিনি কিছু না বলে' চুপ করেই ছিলেন। দেখ্‌লেন ভদ্রলোকটি এক জোড়া দামী শাল গায়ে দিয়ে এসেছেন। খানিকক্ষণ শাল-জোড়াটি নাড়াচাড়া করে' দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন--আপনি এই শাল-জোড়াটি কত টাকায় কিনেছেন? তা'র উত্তরে তিনি বল্‌লেন—পাঁচশ টাকায়। শুনেই বিদ্যাসাগর কি বলেছিলেন জানো? বিদ্যাসাগর তাঁর গায়ের মোটা চাদরখানা ধরে' বল্‌লেন—এই মোটা চাদরখানাতেই আমার দিন কাটে—পাঁচ সিকের কম্বল গায়ে দিলেও শীত বোধ হয় না। উপযুক্ত জবাব পেয়ে ভদ্রলোকটি মাথা হেঁট করে' রইলেন—যতক্ষণ ছিলেন। কেমন জবাব দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর!

(১১)

বন্ধুর এক ভদ্রলোককে নিয়ে বিদ্যাসাগর গেছেন—কল্‌কাতার মিউজিয়ম (যাদুঘর) দেখ্‌তে। বিদ্যাসাগরের পায়ে সেই মুখ-বাঁকানো মার্কা-মারা চটি। দারোয়ান বল্‌লে—চটি জুতো পরে'

মিউজিয়মের ভিতরে যাবার হুকুম নেই—ওই জুতোটা খুলে ভিতরে যেতে পারেন—খালি পায়ে। বিদ্যাসাগর কিছু না বলে' ফিরলেন—গেটের কাছ থেকেই। যাদুঘরের কর্তৃপক্ষের কানে গেল—সেই কথাটা। বিদ্যাসাগরকে চটি জুতো ছেড়ে ভিতরে যাবার নিয়ম—দারোয়ান জানিয়েছিল বলে'। এই কর্তৃপক্ষকে ইংরাজীতে বলা হয়—কিউরেটার। কিউরেটার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন—বিদ্যাসাগরের সাম্‌নে। ঐরূপ নিয়ম থাক্‌লেও তাঁর সম্বন্ধে বাধা নাই বলে' ভিতরে যাবার জন্যে অনেক সাধ্য-সাধনা করলেন। কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভংগ হ'ল না। তিনি তখনি জোর গলায় কিউরেটার সাহেবকে বলেছিলেন—সাধারণের জন্যে যে নিয়ম, আমারো জন্যে সেই নিয়ম চাই। আমার জন্যে আলাদা নিয়ম হবে এ আমি চাই না। এই বলে' তিনি সেখান হ'তে ফিরে এসেছিলেন। মিউজিয়মের কর্তারা এর পর ক্ষমা চেয়ে তাঁকে তাঁর নিজস্ব পোষাকে মিউজিয়মে আস্‌বার জন্যে বলেছিলেন। কিন্তু পুরুষ-সিংহ বিদ্যাসাগর আর কখনো মিউজিয়মে যান নাই।

(১২)

কার্‌মাটারের আর একটা গল্প বলি ঃ—বিদ্যাসাগর কার্‌মাটারে গেলেই সাঁওতালরা তাদের চাষের জিনিষ কিছু-না-কিছু নিয়ে এসে তাঁকে দিত। এক সাঁওতালের চাষ ছিল না—সে বিদ্যাসাগরকে দেবার জন্যে একটা ছোট্ট মুরগীর বাচ্চা নিয়ে এসে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। বিদ্যাসাগর পৈতে দেখিয়ে বল্‌লেন—ও জিনিষ আমাদের ছুঁতে নেই তুই ওটা নিয়ে যা। বিদ্যাসাগর নিলেন

না দেখে সে কাঁদ্‌তে সুরু করলো। দয়ার সাগরের হৃদয় গলে' গেল। তিনি ঐ সাঁওতালের হাত হ'তে মুরগীর বাচ্চাটি নিয়েছিলেন। এত দয়া ছিল তাঁর!

(১৩)

এইবার বিদ্যাসাগর আর তাঁর মায়ের আর একটি কথা বলি। বিদ্যাসাগর হডসন সাহেবের দ্বারা মায়ের ছবি তুলিয়েছিলেন, তোমাদিগকে বলেছি। মায়ে-পোয়ে বসে' আছেন একদিন তাঁদের বাড়ীতে—বীরসিংহে। বিদ্যাসাগর মাকে বল্‌লেন—মা. তোমার তো বিশেষ গহনা নাই—তোমাকে তোমার পছন্দমতো তিনখানা গহনা গড়িয়ে দিতে চাই। তোমার কি কি গহনা তৈরী করতে দেবো, বল তো মা? মা বল্‌লেন—গহনা কি হবে রে আমার—আমার গহনার অভাব কি—তোরা পাঁচ ভাই যে আমার গহনা। ছেলে-মেয়ের চেয়ে কি আর বেশী গহনা মায়ের আছে রে! বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—সে আমি জানি—বুঝি, আমি সাধারণ গহনার কথাই বল্‌ছি। মা বল্‌লেন—আমার আর কোনো গহনা চাই না···তোরা পাঁচ ভাই বেঁচে থাক্—এই গহনা পরেই যেতে পারলে আমি ধন্য হবো। বিদ্যাসাগর নাছোড়-বান্দা! জেদ্ করে' বল্‌তে লাগ্‌লেন—বলো মা, বলো! মা ভগবতী দেবী জানেন—কেমন জিদ্দী ছেলে ঈশ্বরচন্দ্র। অনেক ভেবে তাই বল্‌লেন—যদি আমায় তিনখানি গহনা দিতে তোর এতোই ইচ্ছে হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আমার কি কি গহনা চাই, বলি শোন্! এই বলেই তিনি বল্‌লেন—দ্যাখ্, দেশের ছেলেদের

তেমন পড়াশুনা হচ্ছে না—তা'রা যাতে লেখাপড়া শিখ্‌তে পারে, তা'র মতো একটি স্কুল করে' দে—যাতে ছেলেদের মাইনে লাগ্‌বে না। দ্বিতীয় গহনা আমার হবে—আমার ঐ স্কুলে যে-সব গরীব ছেলে পড়্‌তে আস্‌বে—তাদের থাক্‌বার আর খাবার ব্যবস্থা যাতে থাকে তা'র উপায় করে' দে। তৃতীয় গহনা আমার হবে—এ দেশের গরীব লোকদের চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা নাই—বিনা-ওষুধে অনেকে অকালে মারা যাচ্ছে—তাদের বাঁচ্‌বার জন্যে একটি ডাক্তারখানা বসিয়ে দে—যাতে তা'রা বিনা-পয়সায় ওষুধ পাবে। তা হ'লেই আমার গহনার সাধ পূর্ণ হবে। বলো তো, মা ভগবতী দেবী কত বড় কথা বলেছিলেন—ছেলেকে। ছেলে মায়ের এই উত্তর শুনে আনন্দে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বলেছিলেন—সার্থকনাম আমার মায়ের! স্বর্গের দেবী ভগবতী আমার মা ভগবতী-রূপেই নেমে এসেছেন—লোকমাতা রূপে। এই বলে'ই তিনি মাকে বলেছিলেন—তাই হবে মা। মায়ের নাম অনুসারে তিনি স্কুলের নাম রেখেছিলেন "ভগবতী বিদ্যালয়।" এখন তা'র নাম হয়েছে—"ভগবতী মাল্‌টি পার্‌পাস্‌ ইনষ্টিটিউশন্‌।"

(১৪)

যিনি পরে 'বাংলার বাঘ' বলে' পরিচিত হয়েছিলেন—তিনি সেই প্রথম রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারশিপ পেয়েছেন। দেশের চারদিকেই তখন তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। বিদ্যাসাগর তাঁর এই পুরস্কার পাওয়ার খবর পেয়ে যে কত খুসী হয়েছিলেন,

তা জানানো যায় না। বিদ্যাসাগর ছিলেন তখন চন্দননগরের বাসাবাটীতে। এই 'বাংলার বাঘ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এসেছেন বিদ্যাসাগরের সংগে দেখা করতে—তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিতে। আশুতোষকে দেখেই তাঁর প্রাণে আনন্দ ধরে না! জানোই তো, তিনি অপরকে খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন। বিদ্যাসাগর তখন খুবই অসুস্থ। তবু তিনি বিছানা হ'তে উঠে নিজের হাতে আম কেটে তাঁকে খাওয়াচ্ছেন। এমন সময়ে "মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই সেখানে এসে পৌঁছলেন। যিনি আম খাচ্ছিলেন তিনি বিদ্যাসাগরের সংগে কয়েকটি কথা ক'য়ে চলে' গেলেন। শাস্ত্রী মশাইয়ের সংগে 'বাংলার বাঘ'-এর জানা-শোনা ছিল না। তিনি চলে' গেলে শাস্ত্রী মশাই বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করে' জেনেছিলেন—তিনি প্রথম রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। গুণমুগ্ধ বিদ্যাসাগর মশাই পরে তাঁকে তাঁর কলেজের অধ্যাপক করেছিলেন। *

(১৫)

তোমরা শুনেছ—মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঋণদায় হ'তে মুক্তি পাবার জন্যে বিদ্যাসাগর তাঁর ছাপাখানার ⅓ অংশ বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সংস্কৃত প্রেস ডিপাজিটারীর কাজ তিনি নিজে দেখ্‌তে পার্‌তেন না। কাজেই, অল্পদিনের মধ্যেই নানারকম গোলমাল হ'তে লাগ্‌লো। এই জন্যে

* শনিবারের চিঠি—ভাদ্র, ১৩৬৫।

বিদ্যাসাগর বিরক্ত হ'য়ে ডিপজিটারীর স্বত্ব ছেড়ে দেবার ইচ্ছে করেছিলেন। কিন্তু তিনি যত টাকা চান, কেউ তা দিতে চাইলো না। কাছেই ছিলেন তাঁর এক আত্মীয়—ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি বিদ্যাসাগরকে বল্‌লেন—আপনি যদি বিরক্ত হ'য়ে ডিপজিটারীর স্বত্ব ত্যাগ না করেন, তা হ'লে আমি সেটা নিয়ে আপনার পছন্দমতো চালাতে পারি। বিদ্যা-সাগর সেই ডিপজিটারী যদি বিক্রয় কর্‌তেন তা হ'লে তখ্‌খনি অনেক টাকা পেতেন। কিন্তু তিনি তা না করে' সেই সম্পত্তি সেইখানে ব'সেই ব্রজবাবুকে দান করে' দিয়েছিলেন। পর দিন সকাল বেলায় এক ব্যক্তি টাকা নিয়ে এসে সাধাসাধি করেছিল—ঐ সম্পত্তি কেন্‌বার জন্যে। কিন্তু তিনি কি বলেছিলেন, শুন্‌বে? তিনি বলেছিলেন—বিশ হাজার টাকা দাম হ'লেও দান করেছি! দেখতো কত বুকের পাটা!

(১৬)

মেয়েদের আর্থিক কষ্ট ঘুচাতে পারলে সমাজে তাদের গৌরব বাড়বে—স্বামীর মৃত্যুর পর তা'কে অপরের গলগ্রহ হ'তে হবে না—এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যাসাগর হিন্দু ফ্যামিলি এন্যুয়িটি ফণ্ড স্থাপন করেছিলেন—(১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন)। বিদ্যাসাগর এই ফণ্ডের সংগে প্রায় তিন বছর জড়িত ছিলেন। এর পর ঐ ফণ্ডের পরিচালকদের সংগে তাঁর মতান্তর হওয়ায় তিনি তা'র সংস্রব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আশংকা হয়েছিল—ফণ্ডের কাজে গোলমাল বাধ্‌লে পাছে তাঁর বদ্‌নাম হয়। এই জন্যেই

তিনি লোকহিতকর ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের সংগে আর যোগ রাখেন নাই।

(১৭)

বিদ্যাসাগর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। অনেকে তাঁকে ঠকিয়েছে, আবার অনেকে মিথ্যা আচরণ করে' তাঁর প্রাণে বেদনাও দিয়েছে। এই জন্যে মানুষের প্রতি মাঝে মাঝে তাঁর ঘৃণাও জাগ্‌তো। তাই, যদি তাঁর কানে আস্‌তো—অমুক ব্যক্তি আপনার নিন্দে করছে। তা হ'লে তিনি বল্‌তেন—"রও, ভেবে দেখি, সে-ব্যক্তি আমার নিন্দে করবে কেন? আমি তো কখনো তা'র কোনো উপকার করি নাই।" মানুষের ব্যবহার দেখে তাঁর এই রকম ধারণাই হ'য়ে গিয়েছিল—যাদের উপকার করা যায়, তা'রা প্রায়ই অকৃতজ্ঞ হয়। এই জন্যে তিনি একটি উদ্ভট শ্লোকের প্রায়ই আবৃত্তি করতেন। তারই বাংলা অনুবাদ তোমাদের শোনাই ঃ—

এক ইন্দ্রিয়ের দাস জীব সমুদয়—
মরণের পথে তা'রা হয় অগ্রসর ;
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দাস মানব-নিচয়—
অন্য জীবে কেন তবে বলিবে ইতর ?

বল্‌তে বল্‌তে তাঁর হৃদয়ে জেগে উঠ্‌তো মানুষের উপর ঘৃণা আর অভিমান!—আর ভগবানের প্রতি অবিশ্বাসের ছায়া!

(১৮)

লুসিটেনিয়া জাহাজ-ডুবিতে অনেক লোক মারা যায়। এই খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর কেঁদে উঠে বলেছিলেন—এই দুনিয়ার

যিনি মালিক, আমাদের চেয়েও কি তিনি নিষ্ঠুর ? নানা দেশের এতগুলি লোককে একত্র করে' একসংগে ডুবিয়ে মারলেন ! আমি যা পারি না, তিনি পরম করুণাময় হ'য়ে কেমন করে' সাত-আট-শ লোককে জলে ডুবিয়ে ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বেলে দিলেন ! দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ ? এই সকল দেখ্‌লে দুনিয়ার মালিক কেউ আছেন বলে' তো মনে হয় না !

(১৯)

বর্ধমান স্বাস্থ্যকর জায়গা বলে' প্রসিদ্ধ ছিল। হঠাৎ ইংরাজী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া দেখা দিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বর্ধমানের সুখ ও স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হ'য়ে গেল। বিদ্যাসাগর খবর পেয়ে বর্ধমানে এসে পৌঁছলেন। তাঁর কাজ হ'ল—গরীব-দুঃখীর খবর নেওয়া। তিনি তাদের দোরে দোরে ঘুরে তাদের ওষুধ আর পথ্যের ব্যবস্থা করে' দিতে লাগ্‌লেন। সেই সময়ে দেখা যেত, কত গরীবের ছেলেকে—কত অনাথ মুসলমানের ছেলেকে কোলে করে' তিনি বেড়াচ্ছেন ! গরীব বলে'—মুসলমানের ছেলে বলে' তিনি কোনো শিশুকে তাঁর কোল হ'তে নামান নি। তাঁর প্রকৃতি ছিল এত উদার !

(২০)

একবার কোনো বিশেষ একটা তর্ক-বিতর্কে ছোটলাটের প্রয়োজন হয়েছিল—বিদ্যাসাগরকে। দেখা করবার জন্যে খবর এলো—বিদ্যাসাগরের কাছে। জবাবে বিদ্যাসাগর জানালেন—অল্প দিন হ'ল আমার বাবা মারা গেছেন। এইজন্যে আমার মন

ভালো নেই। আমাদের শাস্ত্রের নিয়মে আমি এক-কাপড়ে আছি। কয়েকদিন ব্যবহার করায় আমার পরবার কাপড় তেমন পরিষ্কার নেই—পায়ে জুতো বা গায়ে চাদরও দিতে পারি না। এই অবস্থায় গেলে যদি আপনাদের অপমান না হয়, তা হ'লে আমি আপনার সংগে দেখা করতে পারি। "গরজ বড় বালাই"! সেই বেশেই যাবার জন্যে ছোটলাট তাঁকে জানালেন। চিঠি পেয়ে বিদ্যাসাগর সেই বেশেই গেলেন—ছোটলাটের কাছে; আর যা-কিছু বল্‌বার আছে তা বলে' সব বুঝিয়ে দিয়ে চলে' এলেন। শুন্‌লে বিদ্যাসাগরের তেজের কথা! দেখ্‌লে বিদ্যাসাগরের জাতীয় ভাব কত উঁচু!

(২১)

কেবল মানুষের জন্যেই তাঁর প্রাণ কাঁদ্‌তো না। মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবের উপরেও তাঁর স্নেহ-দয়া ছিল। বিবেকানন্দ বলে' গেছেন—"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" ঈশ্বরচন্দ্রও জীব-প্রেমে ঈশ্বরের সেবা করতেন। এ-সম্বন্ধে একটা গল্প বলি শোন :— তোমরা জানো, পাখীদের মধ্যে কাক খুব ধূর্ত প্রাণী। এমন কাকগুলোও তাঁর ভালোবাসায় বাঁধা পড়েছিল। তিনি তাদের 'আয় আয়' করে' ডেকে হাতে করে' খাবার দিতেন—আর কাকগুলো এসে তাঁর হাত হ'তে খাবার খেতো। একদিনের কথা শোনো। তাঁর এক বন্ধু ক্ষুদিরাম বসু তাঁর সংগে দেখা করতে এসেছেন। বোধ হয় বড়দিনের কাছাকাছি। কমলালেবুর উৎসব তখন ঘরে ঘরে।

বিদ্যাসাগর কয়েকটা কমলালেবু খেতে দিলেন, বন্ধুকে। তিনি কমলালেবু খাচ্ছেন—আর ছিব্‌ড়েগুলো জান্‌লার ফাঁক দিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছেন দেখে বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—ওহে-ছিব্‌ড়ে-গুলো ফেলে দিচ্ছ কেন? ওগুলো যে খাবার লোক আছে! বন্ধু বল্‌লেন—ছিব্‌ড়েগুলো আবার খাবে কে? বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—খাবার লোক তোমায় দেখাবো। ছিব্‌ড়েগুলো জান্‌লার ও-পাশে রাখো। খাবার লোক পরে আস্‌বে, দেখ্‌বে। বন্ধুর লেবু খাওয়া হ'য়ে গেল। কিন্তু ছিব্‌ড়ে খাবার লোক কেউ তো এলো না। বন্ধুর বিস্ময় দেখে তিনি জান্‌লার কাছে যেয়ে 'আয় আয়' করে' ডাক্‌তেই কয়েকটি কাক এসে পৌঁছলো, আর সেই ছিব্‌ড়েগুলো খেয়ে উড়ে গেল। তাঁর প্রেমে পশু-পাখী বশ হয়েছিল, কিন্তু মানুষ তাঁর প্রেমের আদর বোঝে নাই। এই-জন্যেই তিনি একবার বলেছিলেন—সভ্য আর্যদের চেয়ে অসভ্য সাঁওতালরাও ভালো লোক। মানুষের ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে আর একবার তিনি বলেছিলেন—"এ দেশের উদ্ধার হ'তে এখনো অনেক দেরী আছে। পুরাতন প্রকৃতি আর পুরাতন প্রবৃত্তি যাদের আছে এমন মানুষের চাষ উঠিয়ে দিয়ে সাত-পুরু মাটি তুলে ফেলে নূতন মানুষের চাষ করতে পারলে তবে এ-দেশের মঙ্গল হবে!"—বড় দুঃখেই তিনি এ-কথা বলেছিলেন।

(২২)

বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্পই তোমাদিগকে বল্‌লাম। তাঁর সম্বন্ধে গল্প সব বল্‌তে গেলে একখানা আলাদা বই লিখ্‌তে

হয়। এই রকম একখানি ছোট্ট বইয়ে তা তো হওয়া সম্ভব নয়; এই জন্যে এইখানেই গল্প বলা 'ইতি' করবার আগে তোমাদিগকে আর একটি গল্প বোল্‌বো। শুনে তোমরা হেসে উঠ্‌বে, আর বিদ্যাসাগর মশাইয়ের চরিত্রের আর এক মধুর দৃশ্য দেখে তোমরা খুসীই হবে। গল্পটি এই :—

পূর্ব বাংলার একজন লোক কল্‌কাতায় এসেছিলেন সেখানকার দুটি বড়লোকের সংগে দেখা করবার জন্যে। এক জায়গায় গেলেন তিনি একদিন—দুদিন--তিনদিন! দেখা হ'ল না। চারদিনের দিন সেই বাড়ীতে তাঁর খুবই পিপাসা পেয়েছিল। খাবার জল একটু চাইলেন—কিন্তু সে-বাড়ীর কেউ তাঁকে একটু জল দিল না। ভদ্রলোক রেগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চোখ রাঙা করে' এলেন—বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের তখন খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গেছে। তিনি গা-খোলা অবস্থায় একটা হুঁকো-হাতে তামাক টান্‌তে টান্‌তে নীচের তলার একটা ঘরের দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটি এসেই সাম্‌নেই হুঁকো-হাতে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—বিদ্দেসাগরের সংগে দেখা হবে কি? কথায় তাঁর রাগের ঝাঁঝ বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছিল। বিদ্যাসাগর বুঝে নিয়ে মিষ্টস্বরে বল্‌লেন—দেখা হবে বৈ কি! আপনি বসুন। সে-ব্যক্তি আগেকার বাড়ীতে খাবার একটু জলও পায় নাই—কয়েকদিন হাঁটাহাঁটি করে'ও ঘরের মালিকের সংগে দেখাও করতে পারে নাই—রাগ হ'তেই পারে। সে-ব্যক্তি বল্‌লেন —হবে বৈ কি-র কর্ম নয়—একজনকে সেরে এলাম—এ'কেও

সেরে যাই—হয় তো হোক। বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—তামাক খান্‌ কি? ভাবে বুঝ্‌লেন—তামাক খান তিনি। তামাক দিতে বল্‌লেন চাকরকে। চাকর তামাক সেজে দিয়ে গেল। "ভুড়ুক ভুড়ুক" তামাক টান্‌তে টান্‌তে ভদ্রলোকটির রাগের মাত্রাটা একটু কমে' গেল। এমন সময়ে বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন—আহারাদি হয়েছে কি? সে-ব্যক্তি বল্‌লেন—আর আহারে কাজ নেই—তুমি একবার ডেকে দাও। বিদ্দেসাগরকে দেখে চলে' যাই। বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—আহারাদি না হ'য়ে থাকে তো তা'র জোগাড় হ'তে পারে। এই রকম কথাবার্তা হচ্চে—এমন সময়ে ঐ লোকটির জল-খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে! বিদ্যাসাগর অনেক বলে' ক'য়ে একটু জল খাওয়ালেন। জল-খাবার খেয়ে ঐ ব্যক্তি বল্‌লেন—একবার বিদ্দেসাগরকে ডেকে দিলে তাঁকে দেখে চলে' যাই—এমন দুষ্কর্ম আর করবো না। অনেক পীড়াপীড়ি করে' বিদ্যাসাগর ব্যাপার কি, সব জেনে নিলেন। বিদ্যাসাগর আপনার পরিচয় আর দেন কি করে' যে—আমিই বিদ্যাসাগর। ভদ্রলোকের রাগের মাত্রাটা একটু কম হ'তেই তিনি বুঝে নিতে পেরেছিলেন—যাঁর সংগে তিনি কথাবার্তা বল্‌ছিলেন—হুঁকো-হাতে সেই লোকটিই বিদ্যাসাগর! তখন তিনি একটু অপ্রস্তুত হ'য়েই বলেছিলেন—আপনি কে! আগে না বুঝে আপনার উপর সম্মান দেখাতে পারি নি বলে' আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—আপনার কোনো দোষই হয় নাই—মানুষ ঐ-রকম অবস্থায় পড়্‌লে

মনের ঐরূপ অবস্থাই হ'য়ে থাকে—এতে আপনার কোনো অপরাধ নাই! বিদ্যাসাগরের ঐ রকম বিনয়-বচন শুনে তিনি খুবই খুসী হ'য়ে অনেক আলাপ করে' নিজের থাক্‌বার জায়গায় চলে' গেলেন। দেখ্‌লে বিদ্যাসাগরের কেমন বিনয়—কেমন ভদ্রতা! এই গল্প বলার সংগে সংগে তোমরাও এই আদর্শ-চরিত বিদ্যাসাগরের মতো বিনয়ী হও—ভদ্র হও—বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা জানিয়ে অন্য বিষয়ে অগ্রসর হই।

মা ও ছেলের কথা

তোমাদিগকে এই বইয়ের প্রথমেই "গোড়ার কথা" অংশে বিদ্যাসাগরের পিতামহ, পিতা ও মাতার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছি। এখানে তাঁর মা ভগবতী দেবীর ও তাঁর সম্বন্ধে আরো কিছু বল্‌বার চেষ্টা করবো।

বিদ্যাসাগরের মা মূর্তিপূজার সার্থকতা বুঝতেন বলে' মনে হয় না। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—আমার মা বল্‌তেন—যে দেবতা আমি নিজের হাতে গড়লাম, সে আমাকে উদ্ধার করবে কেমন করে'? বাঁশ, খড়, দড়ি, মাটি দিয়ে ঠাকুর গড়ে' পূজো করে' কি ধর্ম হয়?

ভগবতী দেবী পরিশ্রম করতে কখনো কাতর হন নি। প্রয়োজন পড়্‌লে তিনি দিন-রাত কিছু না মেনে লোকের সেবা করতে পেছ-পা হ'তেন না। দুপুরে সকলকে খাইয়েও নিজে খেতেন না। কেন জানো? যদি কোনো উপবাসী অতিথি হঠাৎ বাড়ীতে এসে যায়, তবে তাদের খাওয়াবেন কি, এই আশংকায়। খেতে বস্‌তে যাবেন, এমন সময়ে যদি কেউ বাড়ীতে আস্‌তো, তবে তিনি তাঁর সেই খাবার সেই লোককে খেতে দিতেন। তা-ছাড়া তাঁর আর একটি নিয়ম ছিল—দুপুর বেলায় তিনি বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তেন—হাট করতে যারা গেছে তাদের মধ্যে কোনো হাট-ফের্‌তা লোক যদি না নেয়ে, না খেয়ে, শুক্‌নো মুখে তাঁদের বাড়ীর দরজার সাম্‌নে দিয়ে চলে' যাচ্ছে দেখ্‌তে

পেতেন, তবে তাদিকে আদর করে' বাড়ীর ভিতরে এনে বসিয়ে নাইয়ে—খাইয়ে তবে যেতে দিতেন। এ-ছাড়া অপরের কষ্ট দূর করবার জন্যে তিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন। সকলের খবর নেওয়া—তাদের অভাব দূর করা তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। এই গুণটি বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন, তাঁর মার কাছ থেকে। তাই তিনি "মা ও ছেলে" নামক বইয়ে লিখেছিলেন—আমি যদি আমার মায়ের গুণের এক-শ ভাগের এক-ভাগও পেতাম, তা'হলে আমি ধন্য হতাম।" আমার সৌভাগ্য, আমি আমার এমন মায়ের গর্ভে জন্মেছিলাম। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মায়ের শক্তি পেয়েই তত বড়ো হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরও তাঁর শক্তি পেয়েছিলেন—জননী ভগবতী দেবীর কাছ হ'তে।

পরসেবাই ছিল তাঁর কাছে বড় ধর্ম। এই পরসেবার জন্যে তিনি জাতি-বিচার না করে' হাড়ি-ডোম-দুলে প্রভৃতি জাতির বাড়ীতে যারা অসুখে পড়ে' আছে তাদের পথ্যের ব্যবস্থা করতে—তাদের ওষুধ খাওয়াতে ব্যস্ত হ'য়ে থাক্তেন। অনেক সময়ে দেখা যেত সাগু, মিছরি, বার্লি তিনি সংগে করে' নিয়ে যেতেন! অতিথি-অভ্যাগতের সেবাই তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে' মনে করতেন।

এইবার বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে কিছু বলি:—বিদ্যাসাগরের পিতৃভক্তির, মাতৃভক্তির পরিচয় তোমরা কিছু পেয়েছ। এ বিষয়ে আরো কিছু বল্‌বার আছে। পিতামাতার শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়ায় তিনি ছিলেন আস্থাবান হিন্দু; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তিনি

ছিলেন—সাধারণের চেয়ে অনেক উঁচুতে। জাতি-ধর্মের বিচার না করে' তিনি সকলকেই একরূপ ভাবতেন। ব্রাহ্মণ বলে'ই তিনি বড়ো, আর অন্য জাতির হ'লে তিনি ছোট, এ-বিচার তিনি করতেন না। গুণের আদর তিনি চিরদিন করে' গেছেন। চণ্ডাল হ'লেও গুহককে রামচন্দ্র বন্ধু বলে' আলিংগন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর গুণেরই আদর করেছেন—কর্মেরই মহত্ত্ব গেয়েছেন। মানেন নি তিনি জাতিগত অভিমানকে। সোজা কথায়, তিনি ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বিচার না করে' গুণই যে মানুষকে বড় করে— কর্মই যে তা'র গৌরব বাড়ায়, এইটিই মনে করতেন। সামাজিক জীবনে বিদ্যাসাগর ছিলেন মধুর-প্রকৃতি। তিনি আমোদ-প্রমোদ খুব ভালোবাসতেন। লোকের সংগে আলাপ-পরিচয়ে, ঠাট্টা-তামাসায় তাঁর জোড়া ছিল না। পূর্বে এ-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি।

বিদ্যাসাগরের ব্যবহার দেখে অনেক লোকে তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ করতেন। কিন্তু তাঁর আচার-আচরণে তিনি যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন, তা'র পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর আচার-বিচার—ক্রিয়াকলাপ হিন্দুর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না—আবার তাঁর আচার-বিচার, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি ব্রাহ্মদের মতো অবাধ বেগে ইতস্তত দৌড়তো না। এক অনাদি অনন্ত পুরুষ এই জগতের স্রষ্টা, তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁরি নিয়মে চলছে এই বিশ্ব জগৎ—জীব সকল তাঁ হ'তেই জন্মাচ্ছে—আবার তাঁতেই লয় পাচ্ছে এই বিষয়টি তিনি গভীরভাবে বুঝেছিলেন। এই

জন্যেই তিনি প্রথম জীবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন। পরে মত-ভেদ হওয়ায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বল্‌তেন, এই দুনিয়ার মালিক একজন আছেন—বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু তাঁকে পাবার পথ কোন্‌টি, তা বুঝে উঠ্‌তে পারি নে। তাই লোককে তা বোঝাবার চেষ্টাও করি নে। লোককে বুঝতে গিয়ে কি ফ্যাসাদে পড়ে' যাবো? নিজের জন্যে হয়তো বেত খেতে পারি; কিন্তু পরের জন্যে বেত খাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। এ কাজ আমার দ্বারা হবে না! নিজে যেমন বুঝি, সেই পথেই চল্‌বো। পীড়াপীড়ি করলে বোল্‌বো—আমি এর বেশী আর কিছু বুঝি না। কেমন সোজা কথা ছিল, তাঁর!

বিদ্যাসাগরের ধর্মমত কি, জান্‌বার জন্যে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একবার জিজ্ঞাসা করলে অনেক কথার পর তিনি আভাষ দিয়েছিলেন—বোধোদয়ের মতই তাঁর ধর্মমত। গোস্বামী মশাই বলেছেন—বিদ্যাসাগর নিজের ধর্মমত বা বিশ্বাস কারো কাছে প্রকাশ করতে চাইতেন না। তিনি তাঁর ধর্মমত আর বিশ্বাস সকল সময়ে গোপন রাখ্‌বারই চেষ্টা করতেন। কেউ না-ছোড়-বান্দা হ'য়ে পড়লে তাঁকে গম্ভীরভাবে বল্‌তেন—"গীতার উপদেশ মত চলাই ভালো।"

ধর্মপ্রচারকদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল বলে' মনে হয় না। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক কোনো ভদ্রলোক একজন অপর ব্যক্তিকে

বিদ্যাসাগরের বাড়ী অনেক খোঁজাখুঁজি করেও দেখিয়ে দিতে পারেন নি—অথচ তিনি বাদুড়-বাগানেই বাস করেন। এই খবরটা তিনি পেয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন সেই প্রচারকের দেখা তিনি পেয়েছিলেন। বিদ্রূপের বাণ অম্‌নি ছুট্‌লো তাঁর প্রতি: বল্‌লেন কি জানো? তুমি তো আমার বাড়ীর কাছেই থাকো। আমার বাড়ীর পথ তুমি খুঁজে পেলে না—তা হ'লে তুমি মানুষকে কেমন করে' পরলোকের পথ দেখিয়ে দেবে! জানা পথেই পথ খুঁজে পাচ্ছ না—তবে তুমি অজানা পথের সন্ধান অপরকে কেমন করে' দাও বল তো? ও তোমার কর্ম নয়—এ ব্যবসা তুমি ছাড়ো।

বিদ্যাসাগরের কাছে সদর-মফঃস্বল বলে' কিছু ছিল না—সবই ছিল তাঁর খোলা—উদার! মুখে এক, ভিতরে অন্য—এ তাঁর কাজে—ব্যবহারে কখনই কেউ দেখে নি। বিদ্যাসাগর জীবনী-লেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই লিখেছেন—জীবন-চরিত লেখ্‌বার সময় তাঁর-লেখা যে-সব চিঠি তিনি পেয়েছেন, তা'র প্রত্যেকটিতেই "শ্রীহরিঃ শরণম্‌" লেখা আছে। এর থেকে বোঝা যায়, লোকাচারকে বড় করে' তিনি দেখেন নি—জানিয়েছিলেন—প্রত্যেক পত্রে তাঁর হৃদয়ের ধনকে!

স্বনামধন্য পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব যার-তার সংগে মিশ্‌তেন না। ধর্ম-জীবনে তিনি যাঁরই সংগে মিশেছেন—তিনিই ছিলেন ধার্মিক সাধু পুরুষ। এক সময়ে পরমহংস দেব বসে' আছেন—তাঁর আসনে; শিষ্যরা বসে' আছেন—আপন

আপন জায়গায়। এমন সময়ে তিনি বল্‌লেন—চলো, একবার বিদ্যাসাগরকে দেখে আসি! তাঁর এ-রকম ইচ্ছে কেন হ'ল—শিষ্যরা জান্‌তে চাইলে তিনি বলেছিলেন—বিধাতার অনুগ্রহ আর বিধাতার উপর ভক্তি ছাড়া তাঁর মতো মহাপুরুষ পৃথিবীতে আসেন না।

কয়েকদিন গেল। ঠিক হ'ল অমুক দিন বৈকালে তিনি যাবেন বিদ্যাসাগরের সংগে দেখা করতে। সংগে কে কে যাবেন, তা-ও ঠিক হ'য়ে গেল। যথাসময়ে শিষ্যদের সংগে নিয়ে পরমহংস দেব এলেন—বিদ্যাসাগরের কাছে। পরমহংস এসেছেন দেখে বিদ্যাসাগর এগিয়ে গেলেন আদর করে' তাঁকে তাঁর আসনে বসাবার জন্যে। পরমহংস দেব করলেন কি জানো? সেইখানেই বিদ্যাসাগরের কাছেই বসে' পড়ে' বল্‌লেন—খানা-ডোবা-খাল-বিল পার হ'য়ে এইবার "সাগরে" এসে পড়্‌লাম। শুনেই বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, এসে পড়েছেন; আর তো উপায় নেই, দু-এক ঘটী নোনা জল তুলে নিয়ে যান্—এ সাগরে নোনা জল ছাড়া আর কিছুই পাবেন না। পরমহংস দেব বল্‌লেন—সাগর তো কেবল নুনেরই নয়—লবণেক্ষু-সুরা-সর্পী-দধি-দুগ্ধ-ঘৃতাদয়ঃ—এই সাত সাগর ছাড়া আরো তো অনেক সাগর আছে! আপনি তো আর অবিদ্যার সাগর নন—আপনি যে বিদ্যার সাগর! এ-সাগরে রত্নই আছে; এসেছি যখন, তখন রত্নই নিয়ে যাবো। নোনা জল তুল্‌বো কেন?

এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনে সেখানকার সকলেই চুপ্ হ'য়ে গেলেন। পরমহংস দেব তখন বল্‌লেন—বিদ্যাসাগর, তোমার

কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্ব গুণ আসে দয়া থেকে। তুমি যে বিদ্যা দান করচো—অন্ন দান করচো, সেও তো দয়া থেকে। তোমার দয়া নিষ্কাম দয়া। যারা নামের জন্যে—পুণ্যের জন্যে দয়া দেখায়—তাদের দয়া তো নিষ্কাম নয়। তোমার দয়ায় কামনা নেই। তুমি তো সিদ্ধ পুরুষ! শুনেই বিদ্যাসাগর চম্‌কে উঠে বল্‌লেন—এ কী কথা আপনার মুখে? আমি সিদ্ধ পুরুষ? ভগবানের জন্যে সাধনা আমি আবার করলাম কবে? পরমপুরুষ বল্‌লেন—সিদ্ধ পুরুষ তোমায় অম্‌নি বলিনি—জানো তো, আলু-পটল সিদ্ধ হ'লে নরম হ'য়ে যায়। তুমিও তো তেমনি নরম হ'য়ে গেছ। পরের কষ্ট দেখ্‌লে তোমার মন গলে' যায়। তোমার এতো দয়া! তুমি সিদ্ধ নও তো আর কা'কে সিদ্ধ পুরুষ বল্‌বো!

পরমহংস দেব সত্যিই চিনেছিলেন— মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরকে। তিনি বলেছিলেন—বিদ্যাসাগর, তুমি দড়্‌কাঁচা পণ্ডিত নও তো! শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তা'র নজর পড়ে' থাকে ভাগাড়ের দিকে! যারা শুধু পণ্ডিত, তা'রা শুন্‌তেই পণ্ডিত—সংসারে তাদের ঘোর আসক্তি; নিজেদের নিয়েই তা'রা ব্যস্ত। তাদের মন শকুনির মতো কেবল খোঁজে "ভোগের ভাগাড়"! তুমি সে-রকম নও। তোমার মধ্যে আছে—বিদ্যার ঐশ্বর্য—দয়া-ভক্তি- বৈরাগ্য; আরো কত কি! এইরূপ নানা আলোচনার পর সেদিন সান্ধ্য বৈঠক কেটে গেল—তাঁর বাড়ীতে।

পারের যাত্রী বিদ্যাসাগর

এবার দেখ্‌বো আমরা পারের যাত্রী বিদ্যাসাগরকে। অনেক দিন হ'তেই মহাকালের বিষাণ শুন্‌তে পাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিলেন—পত্নী দীনময়ী দেবীও। ১২৯৫ সালের ১লা ভাদ্র—অগস্ত্য যাত্রার দিনে পত্নী দীনময়ী দেবী চলে' গেলেন রক্তাতিসার রোগে—পতি-পুত্র-কন্যা···প্রভৃতির মায়ার বাঁধন কেটে ফেলে। একে তাঁর ভাঙা শরীর—তা'র উপর এই মর্মান্তিক শোক ! তাঁর জীবন নিস্তেজ হ'য়ে পড়্‌লো। হা-হুতাশ করে' এখন দিন কাটে তাঁর। সময়ে সময়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে' ওঠেন—সব শেষ হ'য়ে গেল···বাকি আছে শুধু··· যাবার দিন !

দু-বছর কেটে গেল তাঁর—রোগের সংগে যুদ্ধ করে'। যুদ্ধ আর চলে না—অস্ত্র তাঁর সব ফুরিয়ে গেছে যে ! নাই তাঁর উৎসাহ···নাই তাঁর সজীব প্রাণ···নাই তাঁর স্নায়ুর স্পন্দন। শরীর ভেঙে পড়্‌ছে। সুদক্ষ চিকিৎসকের ঔষধ-পথ্যে কোনো উপকারই হচ্ছে না। ডাক্তার সাল্‌জার এলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চল্‌তে লাগ্‌লো। প্রথমটা একটু উপকার মনে হ'লেও শেষ পর্যন্ত কিছুই হ'ল না ! সেই যে হিক্কা উঠ্‌তে আরম্ভ হ'য়েছিল, তা আর কমে না। এসে জুট্‌লো অল্প জ্বর—পরে সেই জ্বরই হ'য়ে

উঠ্‌লো—সাংঘাতিক। মুখশ্রী হ'য়ে গেল—ম্লান। এইরূপে জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম চল্‌তে লাগ্‌লো—তাঁর অস্থি-পঞ্জর-সার দেহ-প্রাংগণে। এইরূপ যুদ্ধও চলেছিল প্রায় দু-মাস। যুদ্ধ-বিরতির বিষাণ বেজে উঠ্‌লো ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ—রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটের সময়। লিখ্‌তে বুক ফেটে যায়—বাংলা মায়ের কোল শূন্য করে'…ধারা শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রির কালো যবনিকা ফেলে চলে' গেলেন—বিদ্যাসাগরের অমর আত্মা—অনন্তের পথে। বাঙালীর ঘরে ঘরে উঠ্‌লো—হাহাকার ধ্বনি। বিদ্যাসাগর-গত প্রাণ চণ্ডীবাবুর কথায় বলি—"অমর ধামের পথে স্বর্গীয় বিদ্যুতের আলোক জ্বলে' উঠ্‌লো—দেবতারা অমর আত্মাকে আদর করে' নিয়ে যাবার জন্যে গেয়ে উঠ্‌লেন—বিজয়-সংগীত। সুরলোকে বেজে উঠ্‌লো মংগল শংখ—জেগে উঠ্‌লো স্বর্লোকে আনন্দ-কোলাহল। কোলাহল শেষের সংগে সংগে শোনা গেল—এক বিন্দু প্রাণ অনন্তের সনে মিশিয়া লভিল অনন্ত প্রাণ……

পরদিন ১৪ই শ্রাবণ প্রাতঃকালে চিতাগ্নি নির্বাণের পরেই দেশে দেশে—ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লো এই শোক-বাণী। আদালত, স্কুল-কলেজ, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ হ'য়ে গেল! ১৪ই শ্রাবণের প্রভাত-সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ হ'য়ে গেল ম্লান—মেঘে ঢেকে গেল—সারা বাংলার প্রাংগণ।

উপসংহার

বিদ্যাসাগর মশাই-এর জীবন-কথা তোমাদিকে সংক্ষেপে বল্‌লাম। এখন তাঁর ব্যক্তিত্ব আর মহাপ্রাণতা সম্বন্ধে কিছু শোনাই তোমাদের। তাঁর ছিল বিরাট্‌ পৌরুষ, আর ছিল অনন্ত শক্তি। পৌরুষ ও শক্তিতে দীপ্ত ছিল তাঁর হৃদয়। কিন্তু সে হৃদয় আবার বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি—বজ্রের চেয়েও কঠিন, আবার ফুলের চেয়েও কোমল। তাঁর ছিল প্রচুর মনের বল। এই বলেই তিনি বিরূপ অদৃষ্টের বিরুদ্ধে চিরদিনই লড়াই করতে পেরেছিলেন।

কর্ম-জীবনে বড় পদ পেতে হ'লে চাই ইংরাজী ভাষায় গভীর জ্ঞান। তা-ছাড়া এ-ও তিনি বুঝেছিলেন—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সংগে পরিচিত হ'তে হ'লে চাই ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় প্রচুর ব্যুৎপত্তি। এই জন্যে তিনি সেই সময়ে ইংরাজী আর হিন্দী শিক্ষিত দু-জন শিক্ষক রেখে উভয় ভাষা ভালো করেই শিখেছিলেন। হিন্দী 'বেতাল পঁচিসি' পড়েই তিনি বাংলায় লিখেছিলেন—বেতাল পঞ্চবিংশতি।

নিজের উপর তাঁর গাঢ় বিশ্বাস ছিল। ঐশ্বর্যের কাছে বা অপরের ক্ষমতার কাছে কখনই তিনি নতশির হন নি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাই লিখেছিলেন—'কোথাও তুমি নোয়াওনিকো

তোমার উচ্চ শির।' সিদ্ধি লাভের জন্যে অদৃষ্টের অনুগ্রহ তিনি স্বীকার করেন নি কোনোদিন। তিনি মনে করতেন—নাই বা রইল ধনবল, নাই বা রইল জনবল। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে অধ্যবসায়ের সংগে চল্‌তে পারলে সংযোগ আপ্‌নিই আস্‌বে—আর তা'র সংগে মিলে যাবে সত্যিকারের জীবন। তবে এই জীবনের পথে চল্‌তে হবে সততার সহিত। সেই পথে অনেক বিপত্তি, অনেক বাধা এসে দাঁড়ালেও আপনার ওপর বিশ্বাস রেখে তা দূর করতে হবে—বীরের মতো। এইটিকেই তিনি সাধনা বলেছেন। এই সাধন-বলেই তাঁর প্রাণে জাগ্‌তো নব নব উৎসাহ। এই কারণেই তিনি বড়ো হ'তে পেরেছিলেন। জীবনের পথে তিনি 'বিবেক'-এর স্থান দিয়েছিলেন—অনেক উচুতে। তাই তাঁর প্রাণে স্বার্থবোধের সংগে স্বাধীন-চিত্তের সংঘাত বাধ্‌তো। মন যা চায় না, সে-কাজে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা থাক্‌লেও তিনি সে-কাজ করেন নি কোনোদিন। এই কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে থাক্‌লেও তিনি সম্পূর্ণ আলাদা হ'য়েই থাক্‌তেন।

মানুষকে তিনি কখনই ঘৃণা করেন নি। তিনি তাঁর জীবনে—তাঁর কর্মে মানুষেরই জয়গান গেয়েছেন। বিদ্যাসাগর মানুষকেই বড়ো দেখ্‌তেন—দেখ্‌তেন না তা'র জাতি-ধর্ম। উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করে'ও তাঁর জাতিগত অভিমান ছিল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল জীবিকার চেয়েও জীবন বড়ো। মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে অন্নের সংস্থান করতে চাননি তিনি। তিনি ছিলেন বিদ্যার সাগর—দয়ার সাগর। এই 'সাগর' কথা শুনে তোমরা তাঁকে খুব লম্বা-

চওড়া পুরুষ বলে' মনে কোরো না। তিনি ছিলেন বেঁটে-খাটো মানুষ। সত্যেন্দ্রনাথ তাই তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছেন—'দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার।' তাই তিনি বিদ্যাসাগরের দয়া ও স্নেহকে 'বিশাল পারাবার' বলেছেন।

সে-যুগে সারা বাংলা দেশে দীন দুঃখী দুর্গত মানুষেরা তাঁকে জান্‌তো বিপদের দিনের পরম বন্ধু বলে'। মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা শুন্‌লেই দয়ার সাগর পুরুষ-সিংহের হৃদয়ে জাগ্‌তো সহানুভূতির তরংগ। শুধু পুরুষদের জন্যেই তাঁর প্রাণ কাঁদেনি। তিনি বুঝেছিলেন—সামাজিক জীবনে পুরুষের পাশে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে—নারীদেরও। এই জন্যে নারীকল্যাণেও আত্ম-নিয়োগ করতে পেরেছিলেন তিনি। সে-সময়ে মেয়েদের লেখা-পড়া শিক্ষার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। সমাজের অর্ধাংশ নারীসমাজ তখন ছিল প্রায় পংগু। বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি পড়েছিল প্রথমেই এই দিকে। এই জন্যে নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা হয়—তাঁরি দ্বারা। সাধু কার্যের সহায় ভগবান। পাশে এসে দাঁড়ালেন বেথুন সাহেব ও উচ্চপ্রাণা মিস্ কার্পেণ্টার। তাঁদেরি সাহায্যে মেয়েদের স্কুলের প্রতিষ্ঠা হ'ল। মেয়েদের নিয়ে যেতো বাড়ী হ'তে, স্কুলের গাড়ী। সেই গাড়ীর গায়ে লেখা থাক্‌তো—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।" গাড়ীর গায়ে লেখা ঐ কথাই জানাতো তখন জনসমাজে—মেয়েদেরও শিক্ষা দেবার জন্যে শাস্ত্রের বিধান। ক্রমে জাগ্‌লো মেয়েদের শিক্ষার দিকে সাধারণের আগ্রহ আর কর্তব্যবুদ্ধি।

হিমালয়ের মতো বিরাট্ প্রাণ মহাপুরুষ কোনো দিনই আত্ম-বিস্মৃত হন নি। চার পাশের ছোট মন ও দুর্বল হৃদয় মানুষের মাঝখানে এসেছিলেন তিনি জ্যোতির্ময় রূপে। মানব-সমাজে তিনি ছিলেন—বনভূমির বৃক্ষ-শ্রেণীর উচ্চ চূড়ার শ্যামলিমার বহু ঊর্ধ্বে দেবদারু শীর্ষের মতো। মানুষের সেবাই তাঁর ছিল—ঠাকুর পূজা। দুর্গত মানুষের দুঃখ দূর করা—বঞ্চিত মানুষের পীড়ন রোধ করা—অজ্ঞ লোক-সমাজে শিক্ষা ও জ্ঞানের পথ রচনা করা—এই ছিল তাঁর জীবনের পরম সাধনা। তাই তিনি তখনকার সমাজে দাঁড়িয়েছিলেন মহামানবরূপে। কিন্তু এই মানবতার বীজ রোপণ করেছিলেন তাঁর প্রাণে পিতা ঠাকুরদাস আর মা ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্র তখন পড়েন—সংস্কৃত কলেজে। সহপাঠীদের অভাব তাঁর চোখে পড়লে তিনি তাঁর বৃত্তির টাকা হ'তে তাদের দরকারী জিনিষ (বই, কাগজ, কলম, ওষুধ, এমন কি কাপড় পর্যন্ত) কিনে দিতেন। পিতা ঠাকুরদাস ঈশ্বরের এই দয়ার কথা জেনে তাঁকে উৎসাহই দিতেন।……কলেজের ছুটিতে তিনি এসেছেন—বীরসিংহের বাড়ীতে। একদিন দেখ্‌লেন, একজন গরীব লোক শতছিন্ন একখানি কাপড় পরে' আছে। তাই দেখে তিনি গামছাখানি পরে' পরণের কাপড়খানি তা'কে দিয়েছিলেন। গামছা পরে' বাড়ী আসার কারণ জানালে মা ভগবতী দেবী বলেছিলেন—বেশ করেছিস্ বাবা; গরীবকে দান করলে কমে না—বরং বাড়ে। ঈশ্বরচন্দ্র মানব-সমাজে যে মহা-মানবরূপ বনস্পতির মতো শোভিত হ'য়ে ছিলেন, তার মূলে

ছিল বালক ঈশ্বরচন্দ্রের তরুণ হৃদয়ে পিতামাতার করুণার সলিল সেচন।

এই ভারতবর্ষে এখন অনেকেই বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়েছেন কিন্তু এই বাংলা দেশের বিদ্যাসাগর-এর সংগে যেমন দয়ার সাগর মিলিত হ'য়ে মহাসাগর রচনা করেছে—ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে অন্য কোনো বিদ্যাসাগরের এই সৌভাগ্য ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। জীবনকে উন্নত করতে হ'লে মহত্তের আদর্শ চাই। তোমরা বিদ্যাসাগরের পবিত্র স্মৃতিকে আদর্শ করে' আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হও—তোমাদের হৃদয় উজ্জ্বল হোক, এই প্রার্থনা করি।